মাসিক

আলোকধারা

তাসাওউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

রেজিঃ নং-২৭২
২২ তম বর্ষ
৫ম সংখ্যা
মে ২০১৬ ঈসায়ী

- মিরাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা
- ইসলামে শব-ই-বারাআত উদ্‌যাপন নতুন সংযোজন নয়
- তাফসীরে সূরা ফাতিহা শরীফ
- ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ও সালাতের আদর্শ
- ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও শিশু নির্যাতন

ইরানের বোস্তাম নগরে অবস্থিত সুলতানুল আরিফিন হযরত আবু ইয়াজীদ ঈসা তাইফুর বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.)- এর মাযার শরীফ। ১৪ শাবান তাঁর ওফাত দিবস।

গত ১৩ এপ্রিল ২০১৬ নগরীর বিবিরহাটস্থ এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট মিলনায়তনে মাইজভাণ্ডারী একাডেমি আয়োজিত 'তাসাওউফ ও ইসলাম : প্রেক্ষিত সূফী, দরবেশ ও পীর-মুর্শিদ' শীর্ষক রূহানী সংলাপে বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ মোরশেদুল হক।

মাসিক
আলোকধারা

THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজিঃ নং ২৭২, ২১তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

মে - ২০১৬ ঈসায়ী
রজব-শা'বান - ১৪৩৭ হিজরি
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৩ বাংলা

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

যোগাযোগ:
লেখা সংক্রান্ত: ০১৮১৮ ৭৪৯০৭৬
০১৭১৬ ৩৮৫০৫২
মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্ত: ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০
০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ১৫ টাকা
(US $=2)

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
সৈয়দ সলিমুল্লাহ্ শাহ্ রোড, বিবিরহাট
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১। ফোন: ২৫৮৪৩২৫

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর একটি প্রকাশনা

Web:www.sufimaizbhandari.org
E-mail:sufialokdhara@gmail.com

সূচী

■ সম্পাদকীয়:
ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ও সালাতের আদর্শ ---------- ২

■ মিরাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
– ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ ---------- ৩

■ তাফসীরে সূরা ফাতিহা শরীফ
– অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী -- ১২

■ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও শিশু নির্যাতন
– অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান ---------- ১৮

■ ইসলামে শব-ই-বারাআত উদ্‌যাপন নতুন সংযোজন নয়
– মাওলানা মুহাম্মদ মিশকাত ---------- ২৪

■ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা
– মাওলানা নেজাম উদ্দীন চিশ্‌তী ---------- ২৭

■ ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (দ.)
– মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার ---------- ৩১

■ তাওহীদের সূর্য :
মাইজভাণ্ডার শরিফ এবং বেলায়তে মোতলাকার উৎস সন্ধানে
– জাবেদ বিন আলম ---------- ৩৪

■ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাবাররুক এর গুরুত্ব
– আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ বদরুদ্দোজা ---------- ৩৮

■ ঈমান ও আখলাক ঃ পর্ব-১৯ (শেষ অংশ)
– সৈয়দ মুহাম্মদ ফখরুল আবেদীন (রায়হান) ---------- ৪১

■ সাধনের কায়দা জানা চাই, বেকায়দায় করলে সাধন মাওলা রাজি নাই
'বিসমিল্লাহ্ শরিফের তাজিম এবং অনর্থ পরিহার প্রসঙ্গ'
– মাওলানা কাজী মোহাম্মদ হাবিবুল হোসাইন ---------- ৪৫

সম্পাদকীয়...

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ও সালাতের আদর্শ

ইসলাম ফিত্‌রতের ধর্ম। এর আবেদন বিশ্বজনীন। বিশ্বমানবতার সর্বজনীন কল্যাণ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামে শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি রয়েছে অপরিসীম মমতা। ইসলামে বলা হয়েছে: শ্রমিকরা আল্লাহ্‌র বন্ধু। বিশ্বনবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাগিদ দিয়েছেন: 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পাওনা মিটিয়ে দাও।' ইসলাম-পূর্ব ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে অর্থ ও উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল দাস-দাসী নির্ভর। ভাগ্যাহত এসব নরনারীর অমানুষিক পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে তখনকার সমাজ ব্যবস্থা প্রবহমান ছিল। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বেদনাহত চিত্তে তাদের করুণ জীবনচিত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নবুয়তী প্রজ্ঞা ও হিকমতের মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন দুর্দশাগ্রস্ত নিপীড়িত দাসদাসীদের (তৎকালীন বৃহত্তর শ্রমিক শ্রেণী) জীবনচিত্রের আমূল পরিবর্তন রাতারাতি সম্ভব নয়। তাই তিনি সংস্কারমূলক এমন এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন যার ফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী। তিনি তাঁর অনুসারীদের মনে উপ্ত করে দিয়েছিলেন বিশ্ব ও মানবিক ভ্রাতৃত্বের বীজ। বলেছিলেন: 'তারা তোমাদের ভাই। তাদেরকে তাই খাওয়াও যা তোমরা খাও, তাই পরাও যা তোমরা পরিধান করো।' খাদ্যে ও বস্ত্রেই তিনি প্রথমে দাস-দাসী ও মুক্ত মানব মানবীতে সমতা সৃষ্টি করেছিলেন। একসময় মানুষে মানুষে যে দুস্তর ব্যবধান ছিল তা ক্রমশ দূর হয়ে এসে গেল কাছাকাছি-সান্নিধ্যে। দীর্ঘদিনের প্রচলিত দূরত্বের ব্যবধান মুছে মানুষ পরস্পরকে দেখতে পেল কাছাকাছি, পাশাপাশি। এরপর ব্যক্তি মানুষ ও জোটবদ্ধ সমাজের উত্থান আর রোধ করা যায়নি। তিনি এখানে থেমে থাকেন নি। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন দাসদাসী মুক্তির আন্দোলনে। দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করে মানুষকে মুক্তির ময়দানে নিয়ে আসার জন্য ঈমানদারদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তুমুল প্রতিযোগিতা। এ যেন নব চেতনার জোয়ারে ভাসা জনগোষ্ঠীর এক আনন্দ মিছিল। মূঢ় ম্লান মুক মুখে যারা অবস্থান নিয়েছিল 'সবার নীচে, সবার পিছে, সবহারাদের মাঝে' তারা এসে শামিল হয়ে গেল মানুষের কাতারে। কিন্তু এ কাজটি মোটেই সহজ ছিল না। বরং তা ছিল ভীষণ কষ্টকর। এ বিষয়টি কুরআন বন্ধুর গিরিপথ অতিক্রমের সাথে তুলনা করেছেন। মানুষকে উপদেশ দিয়ে কুরআন বলছেন, তারা যেন কষ্টকর বন্ধুর গিরিপথ অবলম্বন করে। কুরআনের ব্যাখ্যা হচ্ছে: (বঙ্গানুবাদ) **"তুমি কি জান-- বন্ধুর গিরিপথ কী? তা হচ্ছে: দাসমুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান ইয়াতীম আত্মীয়কে, অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে, তদুপরি অন্তর্ভুক্ত হওয়া মু'মিনদেরকে এবং তাদের যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয়, ধৈর্য ধারণের ও দয়া দাক্ষিণ্যের; এরাই সৌভাগ্যশালী"** (সুরা বালাদ ৯০, আয়াত ১২-১৮)।

মানবজাতির একটি কলঙ্কিত সঙ্কটকে মোচনের জন্য কুরআন দাসমুক্তি, অসহায় দরিদ্র নিঃস্ব মানুষদের ক্ষুধামুক্তির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী সমাজ গঠনের প্রধান ভিত্তিই হচ্ছে খোদা-ভীতি ও ক্ষুধা মুক্তি। অন্যের প্রয়োজনে সম্পদ ব্যয়ের মনোভাব ও আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে তখনই জাগ্রত হয় যখন মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য স্বীকারের পাশাপাশি তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসতে পারে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে জেঁকে বসা পুঁজিবাদ মানবিকতাকে কেড়ে নিয়ে মানুষকে শুধু মুনাফামুখী করে তুলেছে। আধুনিক কালে শ্রমজীবী মানুষ পুঁজির দাসত্বই করছে। উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমকে যতদিন পর্যন্ত পুঁজির সমমর্যাদার আসন দেয়া না হবে ততদিন পর্যন্ত শ্রমিককে পুঁজিবাদের দাসত্ব করে যেতেই হবে। আর একাংশ কিংবা বিপুলাংশ মানুষের দাসত্ব বজায় রেখে পৃথিবীতে একটি মানবীয় সমাজ গঠন করা যায় না। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে যে গুরুত্বপূর্ণ নসিহত রেখে গেছেন তা এখানে স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন, সাবধান তোমাদের সালাতের বিষয়ে বেশি বেশি যত্নবান থেকো আর তোমাদের দাসদাসীদের অধিকারের কথা কখনো বিস্মৃত হয়োনা। দাসদাসীদের কথা বলতে গিয়ে তিনি তৎকালীন বৃহত্তর শ্রমিক শ্রেণীর অধিকারের কথাই বলে গেছেন। আর সালাতের তাগিদ দিয়ে তিনি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তারা সবাই এক আল্লাহ্‌রই বান্দা। আর সালাত হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের গোলামীর স্বীকৃতি। ঘটনাচক্রে যারা পৃথিবীতে অন্যের গোলামীসহ (হোক তা প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা ব্যবস্থাগত) নানা দুর্দশায় আপতিত হয়ে পড়েছে তাদের প্রতি সদয়াচরণ মানুষকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের উপযোগী করে তুলতে পারে। মে মাসের ১ম তারিখে পৃথিবী ব্যাপী শ্রমিকদিবস পালিত হবে। আর মুসলমানরা ৫ মে (২৭ রজব) পালন করবে পবিত্র মিরাজ শরীফ। এ দিন মানুষের প্রতিনিধি হয়ে মহাপ্রভুর একান্ত সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সেদিন অনেক অর্জন ও অভিজ্ঞতার সাথে মানুষের জন্য নিয়ে এসেছিলেন সালাতের সওগাত। মিরাজ শরীফের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী মাসে শব-ই-বরাতে (১৫ শাবান) বিশ্ব মুসলিম সেই সওগাতেরই পুণ্যময় সাগরে অবগাহন করেন। সালাত ভিত্তিক বন্দেগী পরিপালন আর শ্রমিকের মর্যাদা কায়েমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ বাস্তবায়নে নিরলস শ্রমসাধনাই হোক আমাদের শাশ্বত অঙ্গীকার।

মিরাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

• ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ •

পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মিরাজ প্রমাণিত। কুরআন মাজীদের সূরা ইসরা ও সূরা আন নাজমে মিরাজের বিশদ বিবরণ রয়েছে। যেহেতু মিরাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা অকাট্যভাবে প্রমাণিত সেহেতু এর অস্বীকারকারী কাফির। এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা রয়েছে। আর যখন মিরাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলে মানা হয় তখন মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে যেসব মাসয়ালা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে তা নিরসন করা খুবই সহজ। কেননা, যারা মিরাজ মানে তাদেরকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অদৃশ্য জ্ঞান স্বীকার করতে হবে। হায়াতুন্নবী মানতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল মাকদিসে পূর্বকার সব নবী রাসূল নিয়ে নামায আদায় করেছেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন আসমানে বিভিন্ন নবী রাসূলের সাথে সাক্ষাত করেছেন। অর্থাৎ সকল নবী রাসূলগণ সশরীরে জীবিত। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মিরাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিন স্তরে বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিরাজের তিনটি স্তর আছে।

প্রথম স্তর: এ স্তর মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত। এটি ভৌগোলিক সফর। যেহেতু এ সফর মানুষের সহজে বুঝে আসে সেহেতু এটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তর: এটি মাসজিদে আকসা হতে সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত। এটি সৌরজগতের সীমা পেরিয়ে সপ্ত আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল যা মানুষের কিছুটা জ্ঞানের ভিতরে রয়েছে তাই এটিও কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে, তবে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়নি।

তৃতীয় স্তর: এটি সিদরাতুল মুন্তাহা থেকে কাবা কাউসাইন ও তারও নিকট পর্যন্ত। যেহেতু এটি মুহাব্বত ও রহস্যেঘেরা সফর, এটি ছিল হাবীব ও মাহবূবের মধ্যে বিশেষ সাক্ষাত। তাই এটি সম্পর্কে সূরা নাজমে বলা হয়েছে যে, এ সাক্ষাতে আল্লাহ যা ইচ্ছা তাঁর হাবীবকে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'ফা আওহা ইলা আব্দিহি মা আওহা'। কুরআন মাজীদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার এ অবস্থানকে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে- انه هو السميع البصير

অর্থ- নিশ্চয় তিনি সব শুনেন এবং সব দেখেন। এখানে হুয়া সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ ও রাসূল উভয় উদ্দেশ্য।[১]

যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীবের প্রতি কৃপা দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করছিলেন ও তাঁর প্রিয় হাবীবের সুন্দর কথাগুলো শুনছিলেন। সেহেতু এ আয়াতে হুয়া সর্বনাম দ্বারা মহান আল্লাহ তাআলা উদ্দেশ্য হতে পারে।

আবার যেহেতু এ স্থানে কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাই ছিলেন যিনি আল্লাহর জালওয়া অবলোকন করছিলেন এবং মহান প্রভুর বাণী শুনছিলেন। সেহেতু হুয়া সর্বনাম দ্বারা কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য হতে পারে।[২]

এটি ছিল এমন মুহব্বতের সফর যার সাথে সৃষ্টিজগতের কোন সম্পর্ক নেই। তাই হাবীব (রাসূল) ও মাহবূবের (আল্লাহর) আলোচনা সাধারণ মাখলুক থেকে গোপন রাখা হয়েছে। কখনো হাবীব (রাসূল) বলেছেন মাহবূব (আল্লাহ) শুনেছেন, আবার কখনো মাহবূব বলেছেন হাবীব শুনেছেন। কবি বলেন-

وان قابلت لفظة لن ترانى + بما كذب الفؤاد فهمت معنى
فموسى خر مغشيا عليه + واحمد لم يكن ليزيغ ذهنا

অর্থ- যদি তুমি 'লান তারানি' ও 'মা কাযাবাল ফুয়াদু মা রায়া' উভয়ের পর্যালোচনা কর তবে তুমি বুঝবে যে, হযরত মুসা আ. বেহুঁশ হয়ে গেলেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চোখের পলক পর্যন্ত পড়ল না।

হযরত মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলাকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি আমাকে কখনও দেখতে পাবে না। অর্থাৎ, আমাকে দেখার মত ক্ষমতা তোমার নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লা-মকামে নিয়ে সরাসরি

দেখা দিয়েছেন। তাঁকে দেখার ক্ষমতাও দান করেছেন। প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ও অন্যান্য নবীর মধ্যে তফাত এখানেই।

দু ধনুকের উপমা:

ভালবাসার ভাষাই আলাদা। এর জন্য কোন অভিধানের প্রয়োজন হয় না। এমনিতেই এ ভাষার দ্যোতনা মোহিত করে। পবিত্র কুরআন মাজীদের [ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى] 'সুম্মা দানা ফাতাদাল্লা' আয়াতের উভয়ই ক্রিয়ার কর্তা উহ্য করে হাবীবের [রাসূলুল্লাহর] প্রতি মাহবুবের [আল্লাহর] ভালবাসার যে মহিমা উদ্ভাসিত করা হয়েছে, তা বড়ই রহস্যপূর্ণ। এখানে উভয় ক্রিয়ার কর্তা আল্লাহ হতে পারেন। তখন এর অর্থ হবে আল্লাহ তাঁর হাবীবের কাছে আসলেন এবং আরো কাছে আসলেন। আবার উভয় ক্রিয়ার কর্তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হতে পারেন। তখন অর্থ হবে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর কাছে গেলেন এবং আরো কাছে গেলেন।

আর যদি প্রথম ক্রিয়ার কর্তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানা হয় এবং দ্বিতীয় ক্রিয়ার কর্তা আল্লাহকে মানা হয় যা বেশি যুক্তি সঙ্গত তখন অর্থ হবে হাবীব ও মাহবুব একে অপরের কাছে আসলেন। ইমাম শায়াবানীর বর্ণিত হাদীসে এ ব্যাখ্যায় উপস্থাপিত হয়।

قف يا محمد ! ان ربک يصلی

অর্থ- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াও তোমার প্রভু তোমার কাছে আসছেন।[৩] এখন প্রশ্ন হল আল্লাহ কতটুকু কাছে আসলেন তার জবাব আল্লাহই দিলেন-

فكان قاب قوسين او ادنى

অর্থ- অতএব ছিল দু ধনুকের ব্যবধান অথবা এর চেয়ে কম।[৪]

প্রথম সফর বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত:

বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাসের শেষ দিকে কাবা গৃহের হাতীমে রাতের বেলায় আরাম করছিলেন। হযরত জিব্রাইল আ. এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাগ্রত করলেন। রাসূলুল্লাহ এদিক ওদিক দেখে পুনরায় শুয়ে পড়লেন আবার জিব্রাইল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাগালেন তিনি পুনরায় এদিক সেদিক দেখে শুয়ে পড়লেন। তৃতীয়বার জিব্রাইল আ. জাগিয়ে বললেন, হে আল্লাহর হাবীব, আল্লাহ আপনাকে সাক্ষাতের জন্য আহবান করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফের মুত্তাফাক আলাইহি হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শক্কে সদর করা হয়। মালাউল আলা থেকে তাঁর জন্য এটি থালায় করে বিশেষ হিকমত ও প্রজ্ঞা প্রেরণ করা হয়েছিল। তা দ্বারা তাঁর অন্তরাত্মা ধোয়া হয়। যাতে লা মাকামে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার মত ক্ষমতা অর্জন হয়। এ সময় সফরের জন্য একটি বোরাক উপস্থিত করা হয়।

عن مالک بن صعصعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا انا في الحجر وفي رواية في الحطيم بين النائم واليقظان اذ أتاني آت فشق ما بين هذه الى هذه فاستخرج قلبي ففسله ثم أعيده ثم أتيت بدابة دون البغل فوق الحمار ابيض يقال له البراق فحملت عليه

অর্থ- হযরত মালিক ইবন সা'আসা' থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি হাজরে আসওয়াদ বা হাতীমে ছিলাম আর ঘুম ও চেতনের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ফেরেশতা এসে বক্ষের এখান থেকে এখান পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন। আমার হৃদয় বের করে তা ধৌত করলেন। অতঃপর তা যথাস্থানে রেখে দিলেন। একটি বাহন আনা হল যা খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড় ছিল। এর রং ছিল সাদা। এর নাম বোরাক এর উপর আমাকে আরোহন করা হল।[৫]

যখন বোরাকের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাখা হল তখন বোরাক আনন্দে নাচতে শুরু করল। এটি তার জন্য অনন্য সম্মান। এ সময় হযরত জিব্রাঈল আ. তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন- থাম! তোমার উপর যিনি বসেছেন তাঁর চেয়ে উত্তম কেউ আরোহন করেননি। এ বাহনের গতি এমন ছিল যে, দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর ব্যবধানে তার একটি পা পড়ে।

কবরে হযরত মূসা আ.এর সাক্ষাত:

এ প্রথম স্তরের সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথিমধ্যে হযরত মুসা আ.কে তাঁর কবরে নামায পড়া অবস্থায় দেখতে পান। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ – قَالَ أَتَيْتُ – وَفِي رِوَايَةِ هَدَّابٍ مَرَرْتُ – عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ

অর্থ- হযরত আনাস ইবন মালিক রা. হতে বর্ণিত আছে- নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন, আমি মিরাজ রজনীতে হযরত মুসা আ. এর কবর কসীবুল আহমরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমি মূসা আ.-কে কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছি।[৬]

সারিবদ্ধ অবস্থায় নবীদের অভিনন্দন:

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বায়তুল মাকদিসে পৌছলেন তখন হযরত জিব্রাঈল আ. সাখরার সাথে বোরাককে বাঁধলেন। মাসজিদে সকল নবী রাসূল তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে প্রবেশ করে তাঁদের নিয়ে নামায আদায় করেন। এভাবে সকল নবী রাসূলের ইমাম হিসেবে দুনিয়াবাসীর জন্য এক বিরল দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়। সকল নবী রাসূল তাঁর পিছনে নামায আদায় করে ধন্য হন। কানযুল উম্মাল গ্রন্থে বর্ণিত বিশদ হাদীসের অংশবিশেষ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

حتى انتهى بي الى بيت المقدس فانتهى البراق الى موقفه الذى كان يقف فربطته فيه وكان مهبط الأنبياء ورأيت الأنبياء جمعوا الى فرأيت ابراهيم وموسى وعيسى فظننت أنه لابد من ان يكون لهم امام فقدمني جبريل حتى صليت بين أيديهم-

অর্থ- এভাবে আমাকে নিয়ে হযরত জিব্রাইল বায়তুল মাকদিস আসলেন। বোরাক যেখানে দাঁড়ানোর সেখানে দাঁড়াল। এবং তাঁকে আমি সেখানে বাঁধলাম। এটি ছিল নবীদের আগমনের স্থান। আমি নবীদেরকে দেখলাম তাঁরা আমার দিকে একত্রিত হচ্ছেন। আমি হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা এবং হযরত ঈসা আ.কে দেখলাম। আমি ধারণা করলাম তাঁদের মধ্যে কেউ ইমাম হবেন। তখন জিব্রাঈল আ. আমাকে ইমামতি করতে বললেন, আমি সকল নবীকে নিয়ে দু রাকাত নামায আদায় করলাম।[৭]

সফরের দ্বিতীয় স্তর:

অতঃপর উর্ধ্ব আকাশে সফর শুরু হল। প্রথম আকাশে পৌছার পর হযরত জিব্রাঈল আ. আসমানের দরজায় করাঘাত করেন। আসমানের রক্ষক ফেরেশতা বললেন, আপনারা কারা? আমি জিব্রাঈল। বলা হল আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আসমানের ফেরেশতা দরজা খুলে দিলেন এবং সবিনয়ে সালাম আরজ করে বললেন,

مرحبا يا سيدى يا مرشدى مرحبا

অর্থ- ধন্য হে সরদার! ধন্য হে মুরশিদ!

প্রথম আসমানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে হযরত আদম আ. এর সাথে সাক্ষাত হল। জিব্রাঈল আ. বললেন, এ হল আপনার সন্তান, শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সকল নবীর সরদার। এখানে তাঁদের মধ্যে সালাম কালাম হল। অতঃপর জিব্রাঈল আ. রাসূলুল্লাহকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানের দিকে রওনা হলেন। এ আসমানে হযরত ঈসা আ. ও হযরত ইয়াহ্ইয়া আ. এর সাথে সাক্ষাত হল। এভাবে তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসূফ আ. এর সাথে সাক্ষাত হল। চতুর্থ ও পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন ও ইদরিস আ. এর সাথে সাক্ষাত হল। ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা আ. এর সাথে সাক্ষাত হল। সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম আ. এর সাক্ষাত হল। এ প্রসংগে সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসটি উপস্থাপন করা হলো-[৮]

فانطلق بي جبريل حتى اتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل اليه؟ قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فاذا فيها آدم فقال هذا ابوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح ثم صعد حتى اذا أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل اليه؟ قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت اذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قالا مرحبا بالأخ

অর্থ-আমাকে নিয়ে হযরত জিব্রাঈল আ. প্রথম আসমানে আসলেন। অতঃপর দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো কে? জিব্রাঈল আ. বললেন, আমি জিব্রাঈল। বলা হলো, তোমার সাথে কে? বললেন, আমার সাথে মুহাম্মদ। বলা হলো, তাঁকে কি উর্ধ্ব জগত সফর করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে? বলা হলো, হ্যাঁ। স্বাগতম হে মনোনীত রাসূল! কতই না সুন্দর হে

আগমনকারী। অতঃপর তিনি দরজা খুললেন। প্রবেশ করা মাত্রই দেখলাম হযরত আদম আ.কে। জিব্রাঈল আ. বললেন তিনি আপনার পিতা হযরত আদম আ.। তাঁকে সালাম দেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি উত্তর দিলেন। স্বাগতম হে ভাগ্যবান পুত্র। স্বাগতম হে ভাগ্যবান নবী। অতঃপর আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উঠলেন। দরজা খোলার জন্য বললেন। বলা হলো, কে? বললেন, আমি জিব্রাঈল। আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলা হলো, তাঁকে কি ঊর্ধ্ব জগত সফর করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। স্বাগতম হে সফরকারী। দ্বিতীয় আসমানে প্রবেশ করা মাত্র হযরত ঈসা আ. ও হযরত ইয়াহইয়া আ.কে দেখতে পেলাম। তাঁরা খালাতো ভাই। জিব্রাইল বললেন, ইনি ইয়াহ্ইয়া ও ইনি ঈসা আ. এদেরকে সালাম দেন। আমি সালাম দিলাম তাঁরা সালামের উত্তর দিলেন। তাঁরা বললেন, প্রিয় ভাই স্বাগতম। ভাগ্যবান নবী স্বাগতম।

الصالح والنبى الصالح ثم صعد بى الى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل اليه؟ قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت اذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح ثم صعد بى حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل أو قد أرسل اليه؟ قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت الى ادريس قال هذا ادريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح ثم صعد بى حتى اذا اتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فاذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح ثم صعد بى حتى اذا أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل من معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل اليه؟ قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فاذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح فلما تجاوزت بكى قيل له ما يبكيك؟ قال أبكى لأن غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتى

অর্থ-অতঃপর আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে উঠলেন। দরজা খুলতে বললেন, বলা হলো, কে? বললেন, আমি জিব্রাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ। তাঁকে কি ঊর্ধ্ব জগত সফর করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। স্বাগতম হে আগমনকারী। দরজা খুললে সেখানে হযরত ইউসূফ আ.। জিব্রাঈল আ. বলেন, ইনি ইউসূফ আ. তাঁকে সালাম দেন। আমি সালাম দিলে তিনি উত্তর দেন। স্বাগতম হে সৌভাগ্যবান ভাই, স্বাগতম হে সৌভাগ্যবান নবী।

অতঃপর আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানে উঠলেন। দরজা খুলতে বললেন, বলা হলো, কে? বললেন, আমি জিব্রাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ। তাঁকে কি ঊর্ধ্ব জগত সফর করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। স্বাগতম হে আগমনকারী। দরজা খুললে সেখানে হযরত ইদ্রিস আ.। জিব্রাঈল আ. বললেন, তিনি ইদ্রিস আ. তাঁকে সালাম দেন। আমি সালাম দিলে তিনি উত্তর দেন। স্বাগতম হে সৌভাগ্যবান ভাই, স্বাগতম হে সৌভাগ্যবান নবী।

অতঃপর আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানে উঠলেন। দরজা খুলতে বললেন, বলা হলো, কে? বললেন, আমি জিব্রাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ। তাঁকে কি ঊর্ধ্ব জগত সফর করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। স্বাগতম হে আগমনকারী। দরজা খুললে সেখানে হযরত হারুন আ.। জিব্রাঈল আ. বললেন, তিনি হারুন আ. তাঁকে সালাম দেন। আমি সালাম দিলে তিনি উত্তর দেন, স্বাগতম হে সৌভাগ্যবান ভাই, স্বাগতম হে সৌভাগ্যবান নবী।

অতঃপর আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে উঠলেন। দরজা খুলতে বললেন, বলা হলো, কে? বললেন, আমি জিব্রাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ। তাঁকে কি ঊর্ধ্ব জগত সফর করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। স্বাগতম হে আগমনকারী। দরজা খুললে সেখানে হযরত মূসা আ.। জিব্রাঈল আ. বললেন, তিনি মূসা আ. তাঁকে সালাম দেন। আমি সালাম দিলে তিনি উত্তর দেন। স্বাগতম হে সৌভাগ্যবান ভাই স্বাগতম হে সৌভাগ্যবান নবী। আমি যখন মূসা আ.কে অতিক্রম করছিলাম তিনি কেঁদে উঠলেন। বলা হলো আপনাকে কিসে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, তিনি

আমার পরে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন। আমি জানি আমার উম্মতের চেয়ে তাঁর উম্মত বেশি জান্নাতে প্রবেশ করবে। [আমি আমার উম্মতের কথা ভেবে কাঁদছি]।

ثم صعد بی الی السماء السابعة فاستفتح جبریل قیل من هذا؟ قال جبریل قیل ومن معک؟ قال محمد قیل وقد بعث الیه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجیء جاء فلما خلصت فاذا ابراهیم قال هذا أبوک فسلم علیه قال فسلمت علیه فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح

অর্থ-অতঃপর আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে উঠলেন। দরজা খুলতে বললেন, বলা হলো, কে? বললেন, আমি জিব্রাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ। তাঁকে কি উর্ধ্বজগত সফর করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। স্বাগতম হে আগমনকারী। দরজা খুললে সেখানে হযরত ইব্রাহিম আ.। জিব্রাঈল আ. বললেন, তিনি ইব্রাহীম আ. তাঁকে সালাম দেন। আমি সালাম দিলে তিনি উত্তর দেন। স্বাগতম হে সৌভাগ্যবান ভাই, স্বাগতম হে সৌভাগ্যবান নবী।

ثم رفعت بی سدرة المنتهی فاذا نبقها مثل قلال هجر واذا ورقها مثل آذان الفیل قال هذه سدرة المنتهی واذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان یا جبریل؟ قال أما الباطنان فنهران فی الجنة واما الظاهران فالنیل والفرات ثم رفع بی البیت المعمور یدخله کل یوم سبعون ألف ملک. ثم أتیت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل فاخذت اللبن فقال هی الفطرة أنت علیها وأمتک ثم فرضت علی الصلوات خمسین صلاة کل یوم فرجعت فمررت علی موسی فقال بم أمرت؟ قال أمرت بخمسین صلاة کل یوم قال أمتک لا تستطیع خمسین صلاة کل یوم وانی والله قد جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل أشد المعالجة فارجع الی ربک فاسأله التخفیف لأمتک

অর্থ- অতঃপর আমাকে নিয়ে সিদরাতুল মুন্তাহায় উঠলেন। দেখলাম সে সিদরা তথা কুল গাছের ফল হিজরের খেজুরের ন্যায়। তার পাতাগুলো হাতির কানের ন্যায়। জিব্রাঈল বললেন, এটি সিদরাতুল মুনতাহা। দেখলাম সেখানে চারটি নদী। দু অপ্রকাশ্য, দুটি প্রকাশ্য। বললাম জিব্রাঈল এ দুটি কী? বললেন, অপ্রকাশ্য নদী দুটি জান্নাতে গেছে। আর প্রকাশ্য নদী দুটির একটি হলো নীল ও অপরটি হলো ফুরাত। অতঃপর আমাকে বায়তুল মামূরে নেয়া হলো। যেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। অতঃপর আমার সামনে এক পাত্র শরাব, এক পাত্র দুধ এবং এক পাত্র মধু আনা হলো। আমি দুধ গ্রহণ করলাম। জিব্রাঈল বললেন, এটিই আপনার স্বভাব ও আপনার উম্মতের স্বভাব। অতঃপর আমাকে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায দেয়া হলো। আমি যখন ফিরছিলাম তখন হযরত মূসা আ. জিজ্ঞাসা করলেন,আপনাকে কী দেয়া হয়েছে? বললাম দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পারবে না। আমি আপনার পূর্বে বনী ইসরাঈলের কারণে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। বরং আপনি প্রভুর কাছে যান উম্মতের জন্য কিছু কমিয়ে আসেন।

فرجعت فوضع عنی عشرا فرجعت الی موسی فقال مثله فرجعت فوضع عنی عشرا فرجعت الی موسی فقال مثله فرجعت فوضع عنی عشرا فرجعت الی موسی فقال مثله فرجعت فأمرت بعشر صلوات کل یوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات کل یوم فرجعت الی موسی فقال بما أمرت ؟ قلت أمرت بخمس صلوات کل یوم قال ان أمتک لا تستطیع خمس صلوات کل یوم وانی قد جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل أشد المعالجة فارجع الی ربک فاسأله التخفیف لأمتک قال سألت ربی حتی استحییت ولکن أرضی وأسلم قال فلما جاوزت نادی مناد أمضیت فریضتی وخففت عن عبادی

অর্থ- আমি গেলাম এবং আমার জন্য দশ ওয়াক্ত নামায মাওকূফ করা হলো। আমি যখন ফিরছিলাম তখন হযরত মূসা আ. পুনরায় আরো কমানোর জন্য অনুরোধ করলেন। আমি প্রভুর দরবারে পুনরায় গেলাম এবারও দশ ওয়াক্ত কমানো হলো।

আমি যখন ফিরছিলাম তখন হযরত মূসা আ. পুনরায় আরো কমানোর জন্য অনুরোধ করলেন। আমি প্রভুর দরবারে পুনরায় গেলাম। এবার দশ ওয়াক্ত নামায পড়ার হুকুম দেয়া হলো। আমি যখন ফিরছিলাম তখন মূসা আ. আমাকে আরো কমানোর জন্য অনুরোধ করলেন। আমি পুনরায় প্রভুর দরবারে গেলাম। এবার আমাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার জন্য বলা হলো। আমি হযরত মূসা আ.এর পাশ দিয়ে ফিরছিলাম তিনি বললেন, আপনার উম্মতের জন্য এটিও সম্ভব হবে না। আমি আমার উম্মতের উপর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমি তাদেরকে ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছি। বরং আপরি পুনরায় আরো কমানোর জন্য প্রভুর

কাছে যান। আমি বললাম কমানোর জন্য অনেকবারতো গেলাম আর যেতে লজ্জা হচ্ছে। বরং আমি এতে সন্তুষ্ট এবং এতে আত্মসমর্পনকারী। অতঃপর আমি যখন অতিক্রম করছিলাম তখন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বললেন, হে নবী আপনি আমার ফরয পূর্ণ করেছেন এবং আমার বান্দা থেকে কষ্ট লাঘব করেছেন। অর্থাৎ, আপনার উম্মত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লেও তারা মূলতঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করেছেন বলে ধরে নেয়া হবে। তাদেরকে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সাওয়াব দেয়া হবে। সহীহ বুখারী শরীফ, বাবুল মিরাজ।

সারি সারি ফেরেশতাদের কাতার:

সপ্ত আসমান পর্যন্ত আল্লাহর সকল জগত দেখানের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিদারাতুল মুন্তাহায় আনা হল। এটি আল্লাহর সকল সৃষ্টির জন্য সীমান্তবর্তী স্থান। আর উপরে উঠা নিষেধ। এমন কি ফেরেশতাদের সরদার হযরত জিব্রাঈল আ.ও এর উপরে উঠার ক্ষমতা রাখেন না। যেন উর্ধ্ব জগতের সকল স্তর এখানে এসে শেষ হয়েছে। সৃষ্টিজগতের শেষ সীমা এটি। সামনে আর কোন জগত নেই। এখান থেকে লা মাকাম-এর প্রারম্ভ। তাফসীরে নিশাপুরী ও তাফসীরে দুররে মানসূরে একটি বর্ণনা এরূপ- ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে দুআ করছিলেন, হে আল্লাহ! যার জন্য আপনি কায়েনাত সৃষ্টি করেছেন, যাঁর উপর আপনি অনন্তকাল থেকে দুরূদ পাঠ করছেন, আপনার নির্দেশে আমরাও যাঁর উপর সৃষ্টির পর থেকে দুরূদ পাঠ করছি আজ সেই মহামহিম মেহমান তাশরীফ আনছেন। আমাদেরকে সেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উন্মুক্ত দিদার দাও। আল্লাহ তাআলা তাদের দুআ কবুল করলেন এবং বললেন তোমরা সকলে সিদরার নিচে বসে পড়ো। সকল ফেরেশতা সিদরাতুল মুন্তাহায় এসে সমবেত হলেন। এ দৃশ্যের বর্ণনা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে এভাবে দিলেন-

اذ يغشى السدرة ما يغشى অর্থ- যখন সিদরাতুল মুন্তাহাকে আচ্ছাদিত করল আচ্ছাদিত করার ন্যায়।[৯]

এসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আরো উপরের দিকে রওনা হলেন। বললেন জিব্রাঈল চলো। হযরত জিব্রাঈল আ. আরজ করলেন- لو دنوت أنملة لاحترقت অর্থ-যদি আমি এক ছোট আঙ্গুল পরিমাণ উপরে যাই তবে আমি আল্লাহর জালওয়ায় নিঃশেষ হয়ে যাব। এ প্রসংগে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে, নিম্নে একটি হাদীস পেশ করা হলো-

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت جبريل عليه السلام هل ترى ربك قال ان بيني وبينه سبعين حجابا من نور لو رأيت أدناها لاحترقت

অর্থ- হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমি জিব্রাঈল আ.কে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কি কখনো তোমার প্রভুকে দেখেছ? তিনি বললেন, আমার ও আল্লাহ তাআলার মাঝে সত্তর হাজার নূরের পর্দা আছে। যদি আমি এ সব পর্দার সামান্য কাছে যাই, তবে আমি জ্বলে যাব।[১০]

সিদরাতুল মুন্তাহা এলাকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে জান্নাতের সকল নিয়ামত দেখানো হয়েছে এবং জান্নাতের সব স্থানে সফর করানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার এ স্তরের সফরে বোরাক ও হযরত জিব্রাঈল আ.কেউ ছিলেন না। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীবের জন্য একটি নূরানী সিংহাসন প্রেরণ করলেন। যার নাম ছিল যোখরাফ। যখন তিনি সিদরাতুল মুন্তাহা অতিক্রম করলেন এবং পিছন থেকে ফেরেশতারা বিদায় দিচ্ছিলেন তখন তিনি সামনে নূর দেখছিলেন। আর যখন তিনি সে নূরে আচ্ছাদিত হলেন তখন কোন সৃষ্টি তাঁকে দেখছিলেন না। কারো জ্ঞানে এ নূর সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়। এভাবে তিনি আল্লাহর আরশ সফর করলেন। অতঃপর আরো উপরে উঠলেন।

সফরের তৃতীয় স্তর:

সিদরাতুল মুন্তাহা থেকে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য পর্যন্ত সফরই মিরাজের মূল সফর। মহান আল্লাহ তাআলার জাতী ও সিফাতী সকল নূরানী জগত সফর করাই ছিল মিরাজের উপহার। প্রথমে তিনি আল্লাহ তাআলার নাম মোবারকের সকল স্তর অতিক্রম করতে শুরু করলেন। অতঃপর জাতে ইলাহীর দিকে। মহান রব্বুল আলামীন জাল্লা শানুহুর এ নূরানী স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ছিলেন একা। তাই কখনো কখনো এ সফরে তাঁর একাকীত্ব অনুভূত হল। সাধারণত মানুষ যেরূপ একাকীত্ব অনুভব করে থাকে। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর একাকীত্ব দূর করার জন্য ঘোষণা করলেন-قف يا محمد صلى الله عليه وسلم ان ربك يصلي

অর্থ- হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দাঁড়ান আপনার প্রভু আপনার (স্বাগত জানানোর জন্য) নিকটবর্তী হচ্ছেন।

উপরে যে সফরের কথা বলা হয়েছে তা ছিল মুহাব্বত ও আযমাতের সফর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বিশেষ সফর শুরু হল। সূফীরা একে সফরে বিসাল বা মিলনের সফর বলে। রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্য লাভের সফর। এ সফরে তিনি মাকামে কাবা কাউসাইন-এ পৌঁছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو ادنى

অর্থ- অতঃপর তিনি নিকটবর্তী হলেন এবং আগে অগ্রসর হলেন। অতঃপর (এত কাছে গেলেন) কেবল দু ধনুকের ব্যবধান বাকী রইল অথবা তার চেয়ে কম।[১১]

সকল ব্যবধান ছিন্ন করে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে সান্নিধ্য দিলেন। শুধু খালিক ও মাখলুকের ব্যবধান ছাড়া বাকী সব নিঃশেষ হয়ে গেল। হাবীব মাহবুবের সাথে মিশে গেল। (সুবহানাল্লাহ)

রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

فاوحى الى عبده ما اوحى

তিনি তাঁর বান্দার উপর প্রত্যাদেশ করলেন যা করার।[১২]

হাবীব ও মাহবুবের মধ্যে কী কথা হয়েছে সৃষ্টিজগতের কেউ তা জানে না। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুয়েকটি কথা আমাদেরকে শুনিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন,

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

অতঃপর ফিরার সময় আল্লাহ তাআলা তার জন্য দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের হাদীয়া দিলেন। তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন, হে আমার হাবীব, আমি তো আপনার অনুরোধে পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলাম কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করলে আমি আপনার উম্মতকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সাওয়াব দিব। সুবহানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে হযরত মূসা (আ.)এর দুআ কবুল হল। আর এভাবে হযরত মূসা আ.এর জন্য অন্তত নয়বার নতুন করে মহান আল্লাহর জলওয়া দেখার সুযোগ হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা নবীদের দুআ ফেরত দেন না। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেছিলেন আল্লাহ আমাকে দেখা দাও। আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীবের মাধ্যমে তাঁর সেই দুআ কবুল করলেন।

হাজার বছরের এ সফর চোখের পলকে শেষ করলেন:

হাজার বছরের সফর শেষ করলেন চোখের পলকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোরাকে আরোহন করে কাবা গৃহে অবতরণ করলেন। তখন ছিল তাহাজ্জুদের সময়। হাদীস শরীফে এসেছে-

فاستيقضت وانا بالمسجد الحرام

অর্থ-আমি যখনই সব ভ্রমণ শেষ করে ফিরলাম তখন আমি কাবা গৃহে ছিলাম।

সিদ্দিক আকবরের ঈমান:

মিরাজের ঘটনা আরবের কাফেরের জন্য এক বড় উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠল। তারা এটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করা শুরু করল। কীরূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায়। আবু জেহেল মক্কার গলিতে গলিতে মানুষ লেলিয়ে অপপ্রচার শুরু করে দিল । মিথ্যা বলার শেষ আছে। আজই প্রমাণিত হল মুহাম্মদ যা বলছে সবই বানোয়াট। কারণ একজন মানুষের পক্ষে এরূপ দাবী করা নিতান্তই মিথ্যা। কেউ এক রাতে মক্কা থেকে বায়তুল মাকদিস সেখান থেকে সাত আসমান অতঃপর উর্ধ্বজগত। অসম্ভব। আবু জেহেল হযরত আবু বকর সিদ্দিককে খুঁজছিল। পথিমধ্যে তাঁর দেখা হয়ে গেল। আবু জেহেল বলল, যদি কেউ দাবী করে যে, আমি রাতের সামান্য সময়ে বায়তুল মাকদিসে গেলাম অতঃপর সাত আসমান অতঃপর উর্ধ্বজগত সফর করে মুহূর্তের মধ্যে আবার ফিরে আসলাম। তুমি কি বিশ্বাস করবে? তিনি বললেন, অসম্ভব। আবু জেহেল বলল, এ দাবী তোমার বন্ধু মুহাম্মদ করেছে। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক আবু জেহেলকে সম্বোধন করে বললেন, যদি তিনি বলে থাকেন তবে আমি অবশ্যই বিশ্বাস করলাম। কেননা, তাঁর কথায় না দেখে আল্লাহকে বিশ্বাস করেছি। এটি বিশ্বাস

করতে অসুবিধা কোথায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললে অবশ্যই সত্য বলেছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে শুনার পূর্বে মিরাজকে বিশ্বাস করার কারণে তাঁর উপাধি হয়ে গেল সিদ্দিক বা বিশ্বাসী।

রাসূলুল্লাহ (দ.)'র জ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়ার দুঃসাহস:

কাফির মুশরিকরা আবু জেহেলের নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে হাযির। তারা এসেই বায়তুল মাকদিস সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করা শুরু করল। তাদের মধ্যে যারা আগে বায়তুল মাকদিসে সফর করেছে তাদেরকেও সাথে করে নিয়ে আসল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এলোমেলো প্রশ্ন করে কোনভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। যাতে করে মিরাজের ঘটনাকে অবলম্বন করে ইসলামের বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান নেওয়া যায়। তারা প্রশ্ন করল আপনি যদি রাতের বেলায় বায়তুল মাকদিসে যেয়ে থাকেন তবে বলেন বায়তুল মাকদিসের দেয়াল কীরূপ, এর দরজা, জানালার সংখ্যা কত এর ধরণ কীরূপ, বায়তুল মাকদিসের ছাদের আকার কেমন ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা দেন। তাদের এসব প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল কোন ভাবে মিথ্যা প্রমাণ করা। কেউ কোন বাড়িতে গেলে সে বাড়ির দরজা জানালা গণনা করে না। মুশরিকদের এসব অনর্থক প্রশ্নের উত্তরের জন্য মহান রাব্বুল আলামীন হযরত জিব্রাঈল (আ.)কে পাঠিয়ে দিয়ে বলেন, জিব্রাঈল তুমি আমার প্রিয় হাবীবের জন্য বায়তুল মাকদিস তাঁর সামনে এনে রাখ। যেন তিনি তা দেখে দেখে তাদের উত্তর দিতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়ে গেলেন আর মুশরিকরা তাদের স্মৃতি ঠিক করে নিলেন। আলহামদুলিল্লাহ। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبنى قريش قمت فى الحجر فجلى الله لى بيت المقدس فطفقت اخبرهم عن آياته وأنا أنظر اليه (صحيح البخارى)

অর্থ-হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে শুনেছি- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন কুরাইশরা আমার মিরাজের ঘটনা অস্বীকার করল তখন আমি হজরে আসওয়াদের পাশে দাঁড়ালাম। আর আল্লাহ তাআলা আমার জন্য বায়তুল মাকদিস স্পষ্ট করে দিলেন। আমি দেখে দেখে বায়তুল মাকদিসের সকল নিদর্শন বর্ণনা করে দিলাম।[১৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বায়তুল মাকদিস সম্পর্কে সব খবর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন তাহলে বলুন, আমাদের কিছু কাফেলা আপনার মিরাজ সফরের রাস্তায় ছিল তারা এখন কোথায়? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের প্রথম কাফেলার সাথে 'রাওহা' নামক স্থানে আমার সাক্ষাত হয়। যার নেতৃত্বে ছিল অমুক গোত্রের অমুক। তাদের একটি উট হারিয়ে যায়। তারা সেই উটের তালাশে ছিল। আমি পিপাসার্ত ছিলাম তাদের কাছে পানি চেয়ে আমি এক গ্লাস পানি পান করি এসময় তারা উটটি খুঁজে ফিরছিল। তাদের কেউ কেউ বলছিল এতো মুহাম্মদের আওয়াজ! তোমাদের সে কাফেলা ফিরলে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন আমি যখন 'যি ফাযা' নামক স্থানে পৌছলাম তখন তোমাদের আরেক কাফেলার দেখা পেলাম। তাদের কাফেলায় একটি উটের উপর অমুক অমুক বসা ছিল। আমার বোরাকের আওয়াজে উটটি ভয়ে পালাতে গেলে তারা উভয়ে উট থেকে পড়ে যায়। ফলে তাদের একজনের হাত ভেঙ্গে যায়। কাফেলা আসলে তাদের কাছে তা জেনে নিও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, আমি যখন তিলভিন' নামক স্থানে পৌছি তখন তোমাদের তৃতীয় কাফেলার সাথে আমার সাক্ষাত হয়। কাফিররা জিজ্ঞাসা করল সে কাফেলার নিদর্শন কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন তাদের কাফেলার সামনে একটি রক্তিম ও কাল বর্ণের উট এবং একটি বুড়ো উট দেখলাম যার উপর সাদা ও কাল দুটি মাদুর বোঝাই ছিল। সে কাফেলা পৌছলে নিজেরাই দেখে নিও।

কাফিররা বলাবলি শুরু করল দলীল তিনটিই অকাট্য মনে হয়। তারা যেতে যেতে এ প্রশ্ন করল যে এবার বলেন তারা কখন নাগাদ মক্কায় এসে পৌছাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন- প্রথম কাফেলা কাল সূর্য উদিত হওয়ার আগে আগে মক্কায় পৌছাবে। দ্বিতীয় কাফেলা

ঠিক দুপুর বেলায় পৌছাবে। আর তৃতীয় কাফেলা সূর্য অস্ত যাওয়ার সামান্য আগে পৌছাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দেয়ার দেরী আর কাফেররা মক্কার উঁচু পাহাড়ে গিয়ে বসে পড়ল। যেন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার ব্যত্যয় দেখতে পায়। আর অন্য দিকে মুসলমানরা তাদের প্রিয় রাসূলের কথার সত্যতা দেখার অপেক্ষায় রইল। এক কাফির চিৎকার করে বলল সূর্যের কিরণ দেখা যাচ্ছে অথচ কাফেলার দেখা নেই। একথা বলতে না বলতে এক মুসলমান চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, ঐ দেখ তোমাদের কাফেলা দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় কাফেলার বেলায়ও তেমন হল যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন।

তৃতীয় কাফেলার পথিমধ্যে একটি অসুবিধা হওয়ায় তারা যথা সময়ে মক্কায় আসতে দেরী হল। এদিকে সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম। অথচ কাফেলা আসছে না কাফেররা বলাবলি শুরু করল মুহাম্মদের কথা সত্য হল না। আগের দু'টির বেলায় সত্য হলেও এটি সত্য হয়নি দেখে তারা খুশিতে নাচতে শুরু করল। আর রাব্বুল আলামীনের রহমতে ঢেউ আসল। নির্দেশ দিলেন সূর্য আপন জায়গায় স্থির থাক যতক্ষণ না তৃতীয় কাফেলা মক্কায় এসে না পৌছায়। কাযী আয়াজ বলেন যতক্ষণ কাফেলা পৌছল না ততক্ষণ সূর্য স্থির দাঁড়িয়ে রইল। এ দৃশ্য দেখে কাফেরদের অনেকে ঈমান আনল। আর যাদের কপাল খারাপ তারা বলতে লাগল এ প্রকাশ্য জাদু। নাউযুবিল্লাহ!

উপসংহার: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মিরাজের মাধ্যমে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়। সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নূরী সত্ত্বা, ইলম গায়ব ইত্যাদি বিষয়ও প্রমাণিত হয়। কারণ লা-মাকামে নূরের তৈরী জিব্রাঈল (আ.)'র প্রবেশের ক্ষমতা নেই অথচ সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা প্রবেশ করলেন। পর্যায়ক্রমে তিনি 'সুম্মা দানা ফাতাদল্লাহর' মকাম অর্জন করলেন। যে জগৎ সম্পর্কে কোন নবী রাসূল বা মুকাররব ফিরেশতার জ্ঞান নেই; সে মহা জ্ঞান তিনি প্রত্যক্ষ করলেন আল্লাহর বিশেষ করুণায়। যা তাঁর অশেষ ইলমে গায়বের বড় দলীল। আমরা মহান আল্লাহর দরবারে বিশেষ শোকরিয়া আদায় করি এজন্য যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর প্রিয় হাবীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রিয় নবীর যোগ্য উম্মত হওয়ার তাউফীক দান করুন। আমীন!

(তথ্যসূত্র)

[1] - সূরা ইসরা আয়াত- ১
[2] -রুহুল মায়ানী খ. ১০ পৃ.৩৬৪
[3] - জামেউল আহাদীস আল কুদসিয়া , হাদীস নং-৬৭৯
[4] -সূরা আন নাজম- আয়াত নং-৯
[5] -সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪৩৪
[6] - সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৬৩০৬
[7] -কনযুল উম্মাল, হাদীস নং-৩১৮৫২
[8] -সহীহ বুখারী হাদীস নং-৩৬৭৪
[9] - সূরা আন নাজম আয়াত নং-১৬
[10] - আল মুজামুল আউসাত, তাবরানী, হাদীস নং-৬৪০৭
[11] -সুরা আন নাজম, আয়াত নং-৯
[12] - সুরা আন নাজম, আয়াত নং-১০
[13] -সহীহ বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৪৪৩৩

সূফী উদ্ধৃতি

■ আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাকে তিনটি স্বভাব দান করেন। যথা– (ক) সমুদ্রের মত বদান্যতা, (খ) সূর্যের ন্যায় উদারতা ও (গ) ভূতলের ন্যায় নম্রতা।"

■ আল্লাহ যাকে যোগ্য ও উপযুক্ত করেন, তার পিছনে এক ফিরআউন লাগিয়ে দেন।"

■ সৎ সাহচর্য সৎকার্য থেকে উত্তম আর কুসংসর্গ কুকার্য থেকে মন্দ।"

–হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাহঃ)

তাফসীরে সূরা ফাতিহা শরীফ

• অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী •

আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী নাওয়ারানা বিনূরিল ঈমান, ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা মান খাস্‌সাহু বিল কুরআন, ওয়া আলা আলিহী ওয়া আস্‌হাবিহী আল্লাযীনা ক্বামূ বিল ফুরক্বান, ওয়া আলা আতবাইহিল্লাজীনা তাবিয়াহুম বিল ইহ্‌সান, বিল খসুস আলা গাউসুল আ'যম আশ্‌শাহ আস্‌সূফী আস্ সৈয়দ আহমাদুল্লাহ আল মাইজভাণ্ডারী ওয়া গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী আশ্‌শাহ, আস্‌সূফী আস্ সৈয়দ গোলামুর রহমান। আম্মাবাদ।

বাংলা উচ্চারণ: আউজুবিল্লাহে মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। (১) আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। (২) আর রাহমানির রাহীম (৩) মালিকি ইআউমিদ্দীন (৪) ইয়া কানা'বুদু ওয়া ইআ কানাসতায়ীন (৫) ইহ্‌দিনাস্‌সিরাতোয়াল মুস্তাকীম। (৬) সিরাতোয়াল্লাজীনা আন্‌য়ামতা আলাইহিম। (৭) গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্বোয়াল্লীন। আমীন।

সরল বঙ্গানুবাদ: পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। (১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (২) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৩) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৪) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো। (৬) তাঁদেরই পথে, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো। (৭) তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নিপতিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের পথেও নয়।

একটি পরিসংখ্যান: এ সূরাতে আয়াত সংখ্যা- ৭, পদ সংখ্যা- ২৭, বর্ণ সংখ্যা-১৪০, আলিফ বর্ণ সংখ্যা-১৭। এ সূরাতে যে সব বর্ণ বিদ্যমান নেই তার সংখ্যা হলো-৭, সে সব হলো: ছা, জীম, খা, যা, শীন, যোয়া এবং ফা।

অবতরণ স্থল: পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ তাই মক্কীয়াহ। তবে একবার মদীনা মুনাওয়ারাতেও অবতীর্ণ হয়েছে মর্মে প্রমাণ বিদ্যমান হেতু তাকে মদনীও বলা হয়েছে। অবতীর্ণের দিবসটি হলো জুমার দিন।

নামকরণ: এ সূরার মর্যাদা ও গুণাবলীর প্রেক্ষিতে বহুবিধ নামকরণ করা হয়েছে। কুরআনে করীমের প্রারম্ভিকা হিসেবে এ সূরার প্রধান নাম হলো- আল ফাতিহা। এতদভিন্ন উল্লেখযোগ্য নাম সমূহ- ১. উম্মুল কুরআন, ২. উম্মুল কিতাব, ৩. ফাতিহাতুল কিতাব, ৪. কুরআনে আযীম, ৫. সাবয়ে মাসানী, ৬. কাফিয়া, ৭. ওয়াকিয়া, ৮. শিফা, ৯. দোয়া, ১০. শোকর, ১১. সাওয়াল, ১২. মুনাজাত, ১৩. তাফ্‌ওইদ, ১৪. রোকিয়াহ, ১৫. হাম্‌দ, ১৬. ইসতিয়ানত, ১৭. সালাত, ১৮. আল কান্‌জ, ১৯. আসাসুল কুরআন, ২০. ইসমে আযম ইত্যাদি।

অবতীর্ণের কারণ: সৈয়দেনা হযরত আলী মরতুদ্বা শেরে খোদা কর্‌রমাল্লাহু ওয়াজহাহুশ্‌ শরীফ এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, একদা আমি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, অকস্মাৎ আমি একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম কেউ যেন আমায় আহ্বান করে বললেন ইয়া মুহাম্মদ অর্থাৎ- হে মুহাম্মদ! এমন আওয়াজ শুনে আমি ভয় পেয়ে ঘরে চলে আসলাম এবং হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাদ্বি.) এর নিকট আমি উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করলাম।

দ্বিতীয় দিবসে খাদীজা (রাদ্বি.) আমাকে তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নওফল এর নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন আসমানী কিতাব তওরাত ও ইনজিলের সুপন্ডিত। তিনি এ ঘটনা শুনে বললেন- হে বৎস! যদি তুমি দ্বিতীয় বার জঙ্গলে যাও এবং অনুরূপ শব্দ আবার শুনতে পাও তাহলে কান লাগিয়ে শুনবে সে কী বলতে চায়।

দ্বিতীয় দিন আমি যখন ঐ জঙ্গলের মাঝে গেলাম পুনরায় একই আওয়াজ শুনতে পেলাম যে, হে মুহাম্মদ! ঐ সময় আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে সোনালী এক আসন আসমান-জমিনের মধ্যখানে বাতাসের উপর অবস্থিত। ঐ আসনে একজন নূরানী বা জ্যোতির্ময় পুরুষ বসে আছেন। আমি তাকে দেখলাম। তিনি আবার ডাক হাঁকলেন হে মুহাম্মদ! আমি বললাম- আমি উপস্থিত আছি। তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল (আ.) আর আপনি তো এ উম্মতের নবী।

অতঃপর তিনি বললেন, বলুন- 'আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।' এর পর তিনি, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' থেকে আরম্ভ করে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে শুনালেন এবং পড়তে বললেন। (তাফসীরে ওয়াজিয)

ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য: সূরা ফাতিহা কুরআনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূরা। প্রথমতঃ এ সূরা দ্বারাই পবিত্র কুরআন আরম্ভ হয়েছে এবং এ সূরা দিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামায আরম্ভ হয়। অবতরণের দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ সূরা রূপে এটিই প্রথম নাযিল হয়। এটি সমগ্র কুরআনের সার সংক্ষেপ। সমগ্র কুরআনের সারমর্ম সংক্ষিপ্তাকারে বলে দেয়া হয়েছে এ সূরাতে। অবশিষ্ট সূরাগুলো প্রকারান্তরে সূরা ফাতিহারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার হাতে আমার জীবন মরণ, আমি তার শপথ করে বলছি সূরা আল ফাতিহার দৃষ্টান্ত তওরাত, ইনজিল, যাবুর প্রভৃতি অন্য কোনো আসমানী কিতাবে তো নেই-ই, এমনকি পবিত্র কুরআনেও এর দ্বিতীয় নেই।

ইমাম তিরমিযী আবু হোরায়রা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রোগের ঔষধ বিশেষ।

বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ গ্রন্থ মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা এসেছে যে, একদা হযরত জিবরাইল (আ.) রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ আকাশের দরজা খোলার শব্দ আসল, হযরত জিবরাঈল (আ.) লক্ষ্য করে বললেন, যে দরজাটি আকাশে এখন খোলা হলো উক্ত দরজা ইতঃপূর্বে অদ্যাবধি কখনো খোলা হয়নি। তিনি আরো বললেন, আকাশ থেকে এমন ধরণের একজন ফেরেস্তা আসছেন যিনি আদম (আ.) এর সৃষ্টির পর থেকে এ মুহূর্ত পর্যন্ত জমিনে আর আসেননি। অর্থাৎ সম্পূর্ণ নবাগত। এ কথাগুলো শেষ করতে না করতে উক্ত ফেরেস্তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি সুখী হউন। এ কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এমন দুটি নূর দিয়েছেন যা আপনার পূর্ববর্তী কোন নবীকেও প্রদান করা হয়নি। তন্মধ্যে একটি সূরা ফাতিহা। আর দ্বিতীয়টি হলো 'আমান্নার রাসূল' আয়াতসমূহ, এ উভয়টি তিলওয়াত করলে প্রতি বর্ণে বিশাল সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে যে আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাপ-বিচ্ছুয় দংশন ব্যক্তিকে সূরা ফাতিহা শরীফ পাঠ পূর্বক ফুঁ দিয়ে করে বিষমুক্ত করতেন, কোন পাগল ও মৃগী রোগাক্রান্তদেরও এ সূরা পাঠ করে সুস্থ করে তুলতেন। এ কথা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে এটাকে বৈধতা দান করেছেন।

হাদীস শরীফ গ্রন্থ দারুকুতনীতে রয়েছে যে, ইবনে আসাকির (রহ.) শুনেছেন যে, সায়ির ইবনে ইয়াজিদ (রাদ্বি.) বলতেন যে, আমার শরীরে কোন স্থানে ব্যথা হলে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা শরীফ পড়ে নিতেন এবং স্বীয় মুখ মোবারক থেকে লালা-থুথু মোবারক নিয়ে ঐ বেদনার স্থানে লাগিয়ে দিতেন। এতে ব্যথা দূরীভূত হত।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদ্বি.) আপন মসনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রিতে শয়ন কারে **'সূরা ফাতিহা'** ও **'কুলহু আল্লাহু আহাদ'** পাঠ করে নিজ শরীরের উপর ফুঁ দিয়ে ঘুমায় তাহলে সে সারা রাত ব্যাপী নিরাপদ থাকবে। তবে মৃত্যুর ব্যাপার ভিন্ন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত তিনি বললেন কুরআনে করীমের দুই তৃতীয়াংশ হলো একাই সূরা ফাতিহা শরীফ।

আবু নাঈম (রাদ্বি.) ও দায়লামী (রহ.) হযরত আবু দারদা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, সূরা ফাতিহা শরীফ ঐ বস্তুর জন্য কাফী বা যথেষ্ট; যে বস্তুর জন্য কুরআনে করীমে পর্যন্ত যথেষ্টতা খুঁজে পাওয়া যায় না। আর যদি সূরা ফাতিহাকে মীযানের পাল্লার এক পাল্লায় এবং সমগ্র কুরআন মজীদকে অপর পাল্লায় রাখা হয় তাহলে সূরা ফাতিহার ওজন সাত গুণ বেশী হবে। সুবহানাল্লাহ!

হযরত হাসান বসরী (রাদ্বি.) হাদীসে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করছেন যে, হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, যে সূরা ফাতিহা শরীফ তিলওয়াত করল সে যেন তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও ফুরক্বানসহ প্রধান

আসমানী কিতাবগুলো একত্রে তিলওয়াত করল। সুবহানাল্লাহ!

হযরত আবু নাঈম 'হুলিয়াতুল আওলিয়া' এর মধ্যে ওয়াকিয় (রহ.) তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, ইবলিশ শয়তান তার পূর্ণ জীবনে চার বার আহাজারী করে ক্রন্দন করেছে এবং তার মাথায় মাটি ঢেলেছে। (১) ঐ সময় যখন তাকে লানত দেয়া হয়েছিল। (২) যে সময় তাকে আকাশ থেকে মাটিতে/ভূমিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (৩) যখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হয়েছিলেন এবং সৃষ্টির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। (৪) যে সময় সূরা ফাতিহা শরীফ অবতীর্ণ হয়েছিল।

আবুশ শাইখ (রহ.) তদীয় কিতাব 'আস্‌সাওয়াব' এ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যার কোন হাজত বা প্রয়োজন এসে যায় তা পূরণে সূরা ফাতিহা শরীফ পাঠ করা চাই, অতঃপর উদ্দেশ্য পূরণ ও মাকসুদ হাসিলের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে মুনাজাত করা চাই, অবিলম্বে তার মাকসুদ পুরা হবে।

যদি কোন ব্যক্তি যাদু-বান-টোনাগ্রস্ত হয়, তখন সূরা ফাতিহা শরীফ পাঠ পূর্বক পানিতে ফুঁ দিয়ে তা চল্লিশ দিন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে পান করালে যাদু বিনাশ হবে।

চিনির বাটিতে গোলাব ও জাফরান সহকারে সূরা ফাতিহা শরীফ লিখে তা চল্লিশ দিন ধুয়ে পানি পান করা হলে সকল ব্যাধি ও যাদু মুক্ত হয়ে যাবে। এটা পরীক্ষিত সত্য।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, এটি কুরআন শরীফের সূরা নামলের একটি আয়াত। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী বিসমিল্লাহ শরীফ কুরআনে করীমের সূরা সমূহের অংশ নয় বরং এটি একটি পৃথক আয়াত। তবে বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে প্রতি সূরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ শরীফ সন্নিবেশিত হয়েছে। লওহের উপর কলম প্রথমে এ বিসমিল্লাহ শরীফ লিপিবদ্ধ করেছে। এটি সর্ব প্রথম অবতীর্ণ হয় হযরত আদম (আ.) এর উপর। আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে সৎ কর্ম প্রারম্ভ করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ পাকের তিন হাজার নাম রয়েছে। তন্মধ্যে এক হাজার ফিরিশতারা জানেন, এক হাজার নবীরা জানেন। তিনশত মুসা (আ.) এর তাওরাতে, তিনশত ঈসা (আ.) এর ইঞ্জিলে, তিনশত দাউদ (আ.) এর জাবুরে আর নিরান্নব্বইটি কুরআন মজীদে বিদ্যমান। বিসমিল্লাহ শরীফের তিনটি নাম। যেমন, আল্লাহু, আর রাহমান, আর রাহীম, এর মধ্যে আল্লাহ পাক ঐ তিন হাজার নামের ভাবার্থ-মর্যাদা অন্তর্ভূক্ত করেছেন; সুবাহানাল্লাহ! ফলশ্রুতিতে এ বিসমিল্লাহ শরীফ যে পাঠ করবে সে তিন হাজার নামের পূণ্য ও মর্যাদা একত্রে লাভ করবে। (তাফসীরে রুহুল বয়ান শরীফ)

সূরা তাওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ লিখা ও পড়া হয়। সূরার প্রারম্ভ ও দুটি সূরার মাঝখানে পার্থক্য করতেও এ আয়াত পড়া হয়। এর ফজিলত ও তাৎপর্য অনেক। প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ বলে আরম্ভ করা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশিত পন্থা। হাদীসে পাকে আছে, যে কাজ বিসমিল্লাহ ব্যতীত আরম্ভ করা হয়, তাতে কোন বরকত হয় না।

সূরার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে প্রতিভাত হয় যে, এর সাতটি আয়াতের মধ্যে প্রথম তিনটি আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং শেষের তিনটি মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা ও দরখাস্তের বিষয়বস্তুর সংমিশ্রন। মধ্যের একটি আয়াত প্রশংসা ও দোয়া মিশ্রিত। মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'নামায অর্থাৎ সূরাতুল ফাতিহা আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত। অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাদের জন্য। আমার বান্দাগণ যা চায়, তা তাদেরকে দেয়া হবে।'

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, যখন বান্দারা বলে 'আলহামদু লিল্লাহ' তখন আল্লাহ বলেন যে, আমার বান্দারা আমার প্রশংসা করছে। আর যখন বলে 'আররাহমানির রাহীম' তখন তিনি বলেন যে তারা আমার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে। আর যখন বলে 'মালিকি ইআউমিদ্দীন' তখন তিনি বলেন আমার বান্দারা আমার গুণগান করছে। আর যখন বলে, 'ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়ীন' তখন তিনি বলেন যে, এ আয়াতটি আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে সংযুক্ত। কেননা এর এক অংশে আমার প্রশংসা এবং অপর অংশে বান্দাদের দোয়া ও আর্জি রয়েছে। এ সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে, বান্দারা যা চাইবে তা তারা পাবে।

বান্দারা যখন বলে 'ইহদিনাস সিরাতোয়াল মুস্তাকীম' তখন আল্লাহ্ বলেন, এ সব আমার বান্দাদের জন্য এবং তারা যা চাইবে তা পাবে।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: সর্বপ্রথম সৃষ্টি, সর্ব সৃষ্টির মূল উৎস আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ পাক যখন আপনার জাতী নূর মোবারক থেকে সর্বপ্রথম সৃষ্টির সূচনা হিসেবে সৃজন করলেন; তখন সৃজিত হয়ে ঐ নূরে মুহাম্মদী তার মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার কুদরতী নূরী চরণে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং সিজদাতে সর্বপ্রথম প্রশংসা বাক্য আলহামদু লিল্লাহ উচ্চারণ করলেন, সুললিত, সুমধুর সর্ব মহান চরম প্রশংসা বাণীর উচ্চারণ দেখে আল্লাহ তায়ালা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। প্রশংসা গীতির প্রতিদান ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ ঐ প্রথম সৃজিত নূর মোবারকের নামকরণ করলেন মুহাম্মদ অর্থাৎ চরম প্রশংসিত। যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা উপহার দিলেন প্রিয় হাবীব মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার মালিক মওলাকে, তাই মালিক-মাওলা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সেরা উপঢৌকন পেলেন চরম প্রশংসিত নাম মুহাম্মদ। যে নাম লক্ষ লক্ষ নবীদের কারো ছিল না। নামের ক্ষেত্রেও তিনি অদ্বিতীয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসার মতো প্রশংসা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ আর আল্লাহর প্রশংসার মতো প্রশংসা করেছেন স্বয়ং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। এই দুই ভিন্ন এদের যথাযোগ্য প্রশংসা করার মতো শক্তি, সামর্থ্য, সাধ্য ও ক্ষমতা অন্য কারো নেই। আল্লাহ পাকের নিকট প্রথম সৃষ্টির প্রথম বাণীটি এতই পছন্দনীয় হয়েছিল যে, পরবর্তীতে তা কুরআনে করিমের প্রান্তিক সূরার প্রথম আয়াতে পরিগণিত করেছেন এবং এতে পরোক্ষভাবে স্বয়ং রাসূলে পাকের প্রশংসাই প্রতিফলিত হয়েছে। কেননা এ কালামটি সর্ব প্রথম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী। এ ছাড়া মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.) জান্নাতে অবস্থান কালে হাঁচি দিলে প্রথম বারেই বলেছিলেন 'আলহামদু লিল্লাহ'। এটি এমন একটি বাক্য যা সর্বাবস্থায় বলা চলে। মীযান বা তুলাদণ্ডে এর ওজন বিশ্বের সব কিছুর উর্ধ্বে। পৃথিবীতে কোন বস্তু বা সৃষ্টির প্রশংসা করা হলে তখন তা বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহরই প্রশংসা হয়ে যায়।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ কারণেই ইরশাদ করেছেন, মান লাম ইয়াশকুরিন্নাসা ফালাম ইয়াশকুরিল্লাহ। অর্থাৎ- যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। তাই মানুষের প্রশংসার্থেও বলা হয় আলহামদু লিল্লাহ।

সাহায্য প্রার্থনা করা: বিসমিল্লাহ এর মধ্যে (বা) বর্ণটি ইস্তিয়ানত বা সাহায্য প্রার্থনা, সাহায্য গ্রহণ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত। আর এর সম্পর্ক হচ্ছে 'আবতাদিয়ু' নামক একটি ক্রিয়ার সাথে যা উহ্য রয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায়– 'আল্লাহর নামের সাহায্য নিয়ে আমি আরম্ভ করছি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু থেকে সাহায্য নেওয়া জায়িজ বা বৈধ। কাজেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তার নেক বান্দা আওলিয়া-এ কিরামের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া, সাহায্য প্রার্থনা করাটাও ইসলাম সম্মত বিষয়। কারণ তারাও আল্লাহ্ তাআলার নাম মোবারকের মতো আল্লাহর মহান সত্তার পক্ষে প্রমাণ বহন করেন এবং আল্লাহর প্রতি পথ প্রদর্শন করেন।

আল্লাহ ভিন্ন ইবাদত কারো জন্য কোন অবস্থাতেই করা যাবে না। করলে তা শিরক বা অংশীবাদীর অন্তর্ভুক্ত হবে। এটা এমন এক গুরুতর অপরাধ আল্লাহ পাক যা কখনো ক্ষমা করেন না। আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনার যে আদেশ রয়েছে তা প্রকৃত ও প্রত্যক্ষভাবে আরোপিত। তবে রূপকভাবে আল্লাহ্‌র বান্দাদের নিকট থেকে সাহায্য চাওয়া এবং গ্রহণ করা (তাদের জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পরে) সমভাবে বৈধ ও ধর্মসম্মত। যেমন আল্লাহ পাক এর স্বপক্ষে ইরশাদ করেন 'ইন্নামা ওয়ালিউকুমুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু'। অর্থাৎ, 'সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ্ এবং রাসূল হলেন তোমাদের রক্ষক; তোমাদের বন্ধু।

সূফী তাত্ত্বিক পর্যালোচনা: "ইয়্যাকা নাসতায়ীন" বাক্যাংশের সূফী তাত্ত্বিক দিক আলোচনা করলে প্রতিভাত হয় যে, আধ্যাত্মিক পথযাত্রী সূফী সাধকদের জন্য আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো সাহায্য কামনা করা সমীচীন নয়। এখানেও তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতার বিষয়টি জড়িত। সূফীতাত্ত্বিক বিশ্লেষক বলেন, 'তলবে য়াউন মায়াইঅত আস্ত'। অর্থাৎ, এখানে সাহায্য চাওয়াটা পারস্পরিক সঙ্গদান সাপেক্ষ ব্যাপার। অর্থাৎ, ইবাদত হবে আমাদের পক্ষ থেকে, আর উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হবে, হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিখ্যাত সূফী সাধক হযরত শাইখ সুফিয়ান সাউরী (রহ.) একদিন মগরীবের নামাযে ইমামতি করছিলেন। যখন তিনি 'ইয়া কানা বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়ীন' আয়াত স্থলে পৌঁছলেন তখন বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন, যখন হুশ ফিরে এলো মুক্তাদীরা

জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে শায়খ, আপনার কী হয়েছিল। শায়খ সাউরী (ক.) বললেন, যখন আমি 'নাসতায়ীন' (আপনারই সাহায্য চাই) বলছিলাম তখন আমি ভীত ও শংকিত হয়ে পড়ি যে, নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র সামনে আল্লাহ্‌র সাথে মিথ্যাচার করছি না তো? যদি আল্লাহ্‌র সাহায্যই কামনা করি তাহলে চিকিৎসকের নিকট সাহায্য চাই কীভাবে? প্রশাসকের নিকট রুযী রোযগার কামনা করি কীভাবে? বাদশার কাছ থেকে সহায়তা কামনা করে থাকি আর এ দিকে বলছি আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করি, এটা মিথ্যাচার না? একথা ভেবেই আমি জ্ঞানহারা হয়ে যাই।

কোন কোন আলিম বলেছেন, দিবা রাত্র পঞ্চ ওয়াক্ত নামাযে মুসল্লীর লজ্জাবোধ থাকা চাই যে, স্বীয় পরওয়ার দিগারের নিকট দাঁড়িয়ে তার সাহায্য চেয়ে আবার অন্যত্র সাহায্য চাওয়া হচ্ছে তাই আল্লাহ্‌র সাথে মিথ্যাচার করা হচ্ছে, (তাফসীরুল ওয়াযীয, ফার্সী, কৃত: শাহ্ আবদুল হাকীম দেহলভী, ১২৯৩ হিজরীতে প্রকাশিত, পৃ. ১৩-১৪)

গায়রুল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া: এখানে গায়রুল্লাহ বলতে যাদের নিকট সাহায্য চাইতে পাক কুরআনে আল্লাহ পাক বারণ করেছেন সে গুলোই বুঝাবে। যেমন ভূত-মূর্তি, দেব দেবী, পাথর-বৃক্ষ, চন্দ্র-সূর্য, জীব-জন্তু, আগুন, অতি অংগ বিশিষ্ট প্রাণী বা প্রাণহীন ইত্যাদি যেগুলো কাফির মুশরিকদের পূজনীয়। তবে আম্বিয়া-আওলিয়া-আহ্‌লুল্লাহ্‌রা কস্মিণকালেও গায়রুল্লাহ নন। এটাই প্রকৃত ঈমানদার মুসলিমের আক্বীদা ও ধর্ম বিশ্বাস।

সরল পথ পরিচিতি: যে মত ও পথের উপর আল্লাহ্‌র ওলীরা ও নেক্‌কার বান্দারা অবস্থান করেন সেটাই হলো সরল পথ। কেননা তাঁরাই হচ্ছেন মহান রাব্বুল আলামীনের পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দা, আর ঐ রাস্তা হচ্ছে পবিত্র ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বা সুন্নি জমাতের রাস্তা। এ মতাদর্শ, আকীদা বা ধর্ম-বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন আকীদা পোষণ করা বা বাতিল আকীদা সম্পন্ন লোকদের অনুসরণ-অনুকরণ করা, তাদের রীতি নীতি অবলম্বন করা সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা যা আল্লাহ্‌র ক্রোধের কারণ হয়ে থাকে।

সৎ পথের দিশা: আল্লাহ তায়ালার নিকট সহজ সরল যে পূণ্য পন্থা কামনা করা হয়েছে তা হলো নিয়ামত ও পুরস্কার প্রাপ্ত দলের পথ। যাদের উপর রয়েছে নবুয়াত রিসালত, বেলায়ত, সিদ্দীকিয়ত, শাহাদাত ও সিলাহিয়াত এর নিয়ামত। নৈকট্য প্রাপ্তদের পথ যারা জাহেরী বা প্রকাশ্য নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছে, যা শরীয়তকে গ্রহণ করার মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং বাতেনী বা অদৃশ্য নিয়ামত পূর্ণাঙ্গভাবে প্রাপ্ত হয়েছে যা হাকীক্বতের রহস্যাদির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি অনুধাবনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। মারিফাতের জ্ঞান বা আল্লাহ্ পরিচিতি মূলক নিয়ামত, যা ত্বরীক্বতভিত্তিক সূফী সাধনার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে।

সরল পথ পেতে হলে: সৎ, সহজ, সরল পথ সিরাতে মুস্তাকীম পেতে হলে সান্নিধ্য ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা আবশ্যক। এতে বন্ধুর খোঁজ করতে হবে। বন্ধুত্ব স্থাপন, সম্পর্ক তৈরী ও সান্নিধ্যে গমন করতে একটা ধারাক্রম অবশ্যই Maintain করতে হবে। কেননা এটা ধাপে ধাপে, স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। যেমন, সাধারণ মু'মিনদের সান্নিধ্য রয়েছে সালিহীন-নেক্‌কার বান্দা আওলিয়া-ই কিরামের সাথে, তাদের কাছ থেকে ঐ সরল পথের সন্ধান নিতে হবে।

সালিহীনদের সম্পর্ক ও রিফাকত হলো শহীদানদের সাথে, শহীদানদের সম্পর্ক হলো সিদ্দীকীনের সাথে, সিদ্দীকীনের বন্ধুত্ব হলো আম্বিয়া-এ কিরামের সাথে। যদি মু'মিনদের থেকে কোন মু'মিন নবীদের সাথে সম্পর্ক ও আন্তরিকতা জুড়তে চায় তাহলে উপরে বর্ণিত ঐ তিন সম্প্রদায় শহীদান, সালিহীন ও আওলিয়া-ই কিরামের সাথে ক্রমান্বয়ে ও উত্তরোত্তর সম্পর্ক স্থাপন করা বাধ্যতামূলক। কেননা উদাহরণ স্বরূপ যদি কেউ বাদশাহ বা সম্রাটের বন্ধুত্ব কামনা করে তাহলে বাদশাহ এর সালতানাতের স্তম্ভ মন্ত্রী-সচিবদের বাদ দিয়ে বাদশাহের সান্নিধ্যে গমন কখনো সম্ভব নয়।

সুতরাং সূফীতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী এটাকে আমরা এভাবে বিশ্লেষিত করতে পারি যে, কোন আহ্‌লুল্লাহ, পীর-মুর্শিদ, আওলিয়া-ই কিরামের ত্বরীকা অবলম্বন না করে আর তাদের তওয়াস্‌সুল বা মধ্যস্থতা গ্রহণ ব্যতিরেকে বর্ণিত ক্রমধারার স্তর অতিক্রম করে মহান আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য অর্জন করা সাধারণ মু'মিনদের জন্য অসম্ভব। তাই কামেল মুর্শিদ গ্রহণের মাধ্যমে তাসাওউফ সাধনাকে ইসলামী মনীষীরা অতীব পছন্দনীয় কর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

হযরত আবুল আব্বাস ইবনে আতা (রাদ্বি.) বিবৃত করেছেন যে, 'মুনইম আলাইহিম' অর্থাৎ যাদের উপর নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে তাদের শ্রেণী বিন্যাস এরূপ:

১ম তবকা: আরিফীনদের, তাদেরকে নিয়ামত দেয়া হয়েছে মারিফাত দ্বারা।

২য় তবকা: আওলিয়ার, তাদের উপর নিয়ামত দেয়া হয়েছে, (ক) সিদ্‌ক বা সততা দ্বারা, (খ) ইয়াকীন বা আস্থা দ্বারা, (গ) সাফওয়াহ বা নিখুঁত ও নিখাদ দ্বারা, (এটাকে আমরা সূফীতাত্ত্বিক জ্ঞান দ্বারা বলেও ব্যাখ্যায়িত করতে পারি)। (ঘ) মারদ্বা বা সন্তুষ্টি দ্বারা।

৩য় তবকা : আবরার, ন্যায়বান ধার্মিক ব্যক্তিবর্গদের তবকা, যাদের উপর নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে হেলম বা শিষ্টতা ও গাম্ভীর্যতা, রিফ্‌ফাত বা সৎ কার্যাদি দ্বারা।

৪র্থ তবকা : মুরীদীন বা আমিত্ব বিলোপকারী অনুগামীদের স্তর। তাদের উপর নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে ইবাদত বন্দেগীর জন্য বল-শক্তি দ্বারা।

৫ম তবকা : আইম্মাতুদ্‌দ্বীন বা ধর্মীয় ইমামদের স্তর, 'আনআমতা আলাইহিম' তাদের উপর নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে ইজতিহাদ ও ইসতিম্‌বাত বা ধর্মীয় সমস্যাদির সমাধান উদ্ভাবন ও দলিল-প্রমাণ পেশ করার যোগ্যতা দ্বারা।

৬ষ্ঠ তবকা : মুকাল্লিদ বা চার মাজহাবের যে কোন একটির অনুসারী, তাদের উপর নিয়ামত দেয়া হয়েছে তকলিদের বা আনুগত্যের ক্ষেত্রে অটলতা ও আবশ্যকীয়তা অনুভবের শক্তি দ্বারা।

৭ম তবকা বা স্তর : মু'মিন বা বিশ্বাসী বান্দাদের। তাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতের ধরণ হলো ইস্তিকামত বা বিশুদ্ধ আকীদা ও আমলের উপর অটল থাকা।

স্মর্তব্য যে, নিয়ামত বা আল্লাহ্‌র করুণা দান দু'ধরনের অবস্থা হতে খালি হয় না। হয়তঃ নিয়ামতে যাহিরী বা প্রকাশ্য নিয়ামত প্রাপ্তি হবে, উদাহরণ স্বরূপ আম্বিয়াদেরকে বাছাই করা এবং তাদের উপর কিতাব নাযিল করা, উম্মতের জন্য নবীগণের দাওয়াত গ্রহণ করে নেয়ার তওফীক দেয়া, তাদের সুন্নাতের অনুসরণ করা, কোন নিকৃষ্ট বিদাত হতে বাঁচিয়ে রাখা, আমর-নাহী বা শরীয়তের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, যেগুলো উবুদিয়ত বা ধর্মাচার এর ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় বিষয়। এ যাবতীয় বিষয়ে সৌভাগ্যবান করা যাহিরী নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত।

অপরটি হলো নিয়ামতে বাতিনী বা অদৃশ্য নিয়ামত প্রাপ্ত হওয়া। উদাহরণ স্বরূপ, যেমন যাহিরী নিয়ামত প্রাপ্তদের অন্তরাত্মার উপর আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত প্রদত্ত হওয়া, তাদের স্বভাবের মধ্যে করুণার ফলগুধারার সৃষ্টি করা, যাতে করে তারা সৃষ্টি জগতে নূরের বর্ষণ বর্ষাতে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'ইন্নাল্লাহা খালাক্বাল খালক্বা ফী জুলুমাতিন, সুম্মা রাশ্‌শা আলাইহিম মিন নূরিহী ফামান আছাবা যালিকান্‌নূর ফাক্বাদ ইহ্‌তাদা ওয়া মান আখত্বাআ ফাক্বাদ দ্বাল্লা।' অর্থাৎ সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি কুলকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সৃষ্টি জগতের উপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নূর মোবারক হতে নূর ছিটিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ নূর প্রাপ্ত হয়েছে সে হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ সৎ পথের সন্ধান পেয়েছে। আর যে ব্যক্তি ঐ নূর প্রাপ্তিতে ভুল করেছে, সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব আল্লাহ্‌র নৈকট্য পথের রুদ্ধদ্বার উন্মোচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হিসেবে যে মাধ্যমটি আল্লাহ পাক নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা হলো আল্লাহ তায়ালার খাস বান্দাদের নূরানী চেহারা মোবারক; তথায় আল্লাহ পাক আপন নূর মোবারকের ছিটা দান করেছেন। ফলশ্রুতিতে ঐ নূর মোবারক প্রত্যক্ষ করে লোকজন তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থী হয়ে থাকে। মূলতঃ তারা খোদার নূরের জলওয়া দেখেই পাগল হয়ে যায়। তাই তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র নিকটই সাহায্য চাওয়া। তাই বিপদগ্রস্তদের মুখে আহ্বান শুনতে পাওয়া যায়, 'ইয়া গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী আলমদদ' কিংবা 'ইয়া গাউসুল আ'যম শাইয়ান লিল্লাহ'। এটা ধর্ম বিধানের পরিপন্থী কোন বিষয় নয়। এ ধরণের সাহায্য কামনা করার পরোক্ষ শিক্ষা দান করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, এটাকে শিরিক বিদআত বলে আখ্যায়িত করা খোদার উপর খোদাগিরী করারই নামান্তর (নাউযুবিল্লাহ)।

নবী-ওলীদের পথের বিপরীত কোনো পথে যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে পরিচালিত না করেন সে প্রার্থনা করে তাকে কবুল করে নেয়ার দোয়া জানিয়ে আমীন বলে উক্ত সূরার সমাপ্তি টানতে হয়। কেননা সকল ইবাদতের পর দোয়া করা শরীয়তের অন্যতম বিধান হিসেবে পরিগণিত। যেমন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আদ্দোয়াউ মাখ্‌খুল ইবাদাত' অর্থাৎ- দোয়া হলো সকল ইবাদতের সার বা মগজ। তাই আমরা এক্ষণে বলি আমীন বিহুরমতে সৈয়দিল মুরসালিন ও বিহুরমতে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (ক.)। ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ!

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও শিশু নির্যাতন

• অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান •

নারীর স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব এবং ঘরের বাইরে নারীর ভূমিকা ও এ জাতীয় অনেক বিষয় সম্পর্কে নিছক সংকীর্ণতা কুপমন্ডুকতা, ভুল ও অন্যায় মূল্যায়ন প্রভৃতির কারণে নারী বলতে এমন এক মূর্তি কল্পনা করা হয় যে হবে চলৎশক্তিহীন প্রাণী। যে প্রাণীটি সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকাই পালন করতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক অঙ্গনে মহিলাদের দেখা গেছে তারা ছিল সেই শ্রেণীর যাদের মধ্যে ইসলামী নীতি-আদর্শের কোন বালাই ছিল না। আসলে আমাদের মুসলমান মহিলাদের জন্য তাদের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নি যার মাধ্যমে তারা সমাজে যথার্থ ভূমিকা ও অবদান রাখতে সক্ষম হয়। আর এ ক্ষেত্রেও পবিত্র কুরআনের কাছে ফিরে যাই। ইসলামের প্রথম যুগে বা তারও আগে ইসলামের আবির্ভাব পূর্বকালের মহিলাদের অবস্থার খতিয়ান নেই। কুরআন মজিদে সে যুগের মহিলাদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তাদের কাউকে যখন কোন মেয়ে সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন চেহারায় কালো ছায়া নেমে আসে এবং অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।" মহান আল্লাহ্পাক আরো বলেন, "তাকে যে সংবাদ দেয়া হয় তার গ্লানি হতে বাঁচার জন্য সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে"। দারুন চিন্তায় পড়ে যায় এবং ভাবতে থাকে," অপমান ও হীনতার ভেতরও তাকে কি রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে।" ইসলাম আসার পূর্বে এটাই ছিল মেয়েদের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। ইসলাম যে নারীকে অপমান লাঞ্ছনার অতল গহ্বর থেকে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত করেছে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা-দীক্ষায় নারী ও পুরুষকে পরস্পর সহযোগী ও সহকর্মী চিহ্নিত করেছে। তবে যে বিষয়টি এখানে তুলে ধরতে চাই, তা হলো ইতিহাসের আগাগোড়াই মুসলিম মহিলারা দু'টি শ্রেণীর কাছ থেকে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে। একটি হলো- তথাকথিত বুদ্ধিজীবীশ্রেণী, যারা বুদ্ধিজীবীর ভাঁড়ামী নিয়ে নারীকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। অপর শ্রেণীটি হলো হুঁশ-জ্ঞানহারা বন্ধ শ্রেণী। নিশ্চিতভাবেই নারীদের উপর শোষণ এবং নারীদের অন্যায়ভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে যে, নারীকে এমন হতে হবে যে শুধু একটি মাত্র পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এ সীমারেখা থেকে বের হবার কোন অধিকার ও অনুমতি নেই। এটা ছিল মস্তবড় ভুল।

রাসুলে পাক্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ সম্পর্কে " শুধুমাত্র সম্মানি লোকেরাই নারীদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করে, আর যারা অসম্মানিত, নারীদের প্রতি তাদের আচরণও হয় অসম্মানিত। (তিরমিযী)

নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর গুরুত্বপূর্ণ হাদীস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় শোষক ও সাম্রাজ্যবাদীরা বলতে শুরু করেছে যে, ইসলাম নারীকে সীমাবদ্ধ গন্ডিতে অন্তরীণ করে রেখেছে। অন্যদিকে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী যাদের দাবী হলো নারীকে মাঠে ময়দানে তৎপর হতে হবে। তারা অশ্লীলতা ও নগ্নতার সয়লাব সৃষ্টির পথে ওকালতি করেছে, যাতে নারীকে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে ব্যবহার করতে পারে। তারা আসলে নারীদের নিয়ে ব্যক্তিগত সুবিধা ভোগের চিন্তাই করেছে। নারীদের অবস্থার জন্য প্রাণ কেঁদেছে বলে নয়। মোট কথা, এভাবেই অজ্ঞ বন্ধ এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী যারা নারীদের মাঠে ময়দানে নামিয়েছে তারা উভয়েই মানব সমাজে বিশেষতঃ কিছুটা ইসলামী চিন্তা-চেতনা বিদ্যমান এমন নারীদের উপর জুলুম শোষণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে।

সম্প্রতি যেটি সবচেয়ে হৃদয়বিদারক তা হল শিশু নির্যাতন ও হত্যা। অপহরণের পর শিশু হত্যা, ধর্ষণের পর শিশু হত্যা, পারিবারিক অস্থিরতা, মা-বাবার দাম্পত্য কলহসহ বিভিন্ন কারণে তাদের হাতে সন্তান হত্যার অভিযোগও কম নয়।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের ২০১৪ ও ২০১৫ খ্রি. এবং এ বছরের মার্চ পর্যন্ত শিশু হত্যার তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, সেগুলোয় শিশু হত্যার কারণ থাকেনা। ফলে শিশু হত্যার কারণগুলোও জানা যায় না। ২৬৭টি বেসরকারী ফোরামের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে মোট ৭৫টি শিশু বিভিন্নভাবে হত্যার শিকার হয়েছে। এর মধ্যে অপহরণের পর হত্যা করা হয় ৯ জনকে। মা-

বাবার হাতে ১৬টি শিশু খুন হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৩ জনকে। অবশ্য পত্রিকা ও নিজস্ব সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বেসরকারি সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বলেছে, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে ১৫২টি শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু পারিবারিক নির্যাতনে ৩৫টি এবং অপহরণের পর ১৩টি শিশুকে হত্যা করা হয়। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৫ জনকে। ২৬টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে শারীরিক নির্যাতনের পর। মা-বাবার হাতে সন্তান খুন হওয়ার পেছনে পারিবারিক অস্থিরতা, দাম্পত্য জীবনে অসহনীয় পরিবেশ ও বিষণ্ণতার মতো কারণগুলো থাকতে পারে বলে মনে করেন মনোরোগ চিকিৎসকরা।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের বিশেষজ্ঞদের মতে, সামাজিক অস্থিরতা শিশু হত্যার বড় কারণ। এমন সমস্যাকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে মোকাবিলার পাশাপাশি মা-বাবার মানসিক চিকিৎসারও প্রয়োজন রয়েছে। শিশু অধিকার ফোরামের মতে, ২০১৪ খ্রি. মোট ৩৬৬টি শিশুকে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে অপহরণের পর মুক্তিপণের দাবিতে ৫২টি শিশুকে এবং ধর্ষণের পর ২১টি শিশুকে হত্যা করা হয়। গত বছর হত্যা করা হয় ২৯২টি শিশুকে। এর মধ্যে ৬২টি শিশুর লাশ পাওয়া যায় নিখোঁজের পর। ৪০টি শিশুকে অপহরণের পর মুক্তিপণের জন্য হত্যা করা হয়। মা-বাবার বিরুদ্ধে ৪০টি শিশু খুনের অভিযোগ রয়েছে। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় ৩০টি শিশুকে।

সিলেটের রাজন ও খুলনার রাকিব হত্যার দ্রুত বিচার হয়েছে। আসকের দেওয়া তথ্য বলেছে, এ বছর প্রথম তিন মাসে ১৫২টি শিশু হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে ৭০টি।

সিলেটের সবজি বিক্রেতার শিশু শেখ সামিউল আলম রাজন (১৪) এবং খুলনার গ্যারেজ কর্মী রাকিব (১২), দুজনকেই হত্যা করা হয় নৃশংসভাবে। রাজনকে গত বছর ৮ জুলাই এবং রাকিবকে ৩ আগস্ট হত্যা করা হয়। ভিন্ন এলাকায়, ভিন্ন তারিখে, ভিন্ন কারণে এই দুটি শিশুর হত্যা নাড়িয়ে দেয় পুরো দেশকে। অবশ্য এই হত্যার রায় হয় একই দিনে, গত বছরের ৮ নভেম্বর। ১৭ কার্যদিবসে রাজন হত্যা বিচার শেষ হয়। চারজনকে ফাঁসির আদেশ দেন আদালত।

স্বল্প সময়ের মধ্যে এই বিচার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে বলে মন্তব্য আইনবিদ ও অপরাধ বিজ্ঞানীদের। বহুল আলোচিত এই দুটি হত্যাকান্ডের এ দন্ডাদেশকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে রায় ঘোষণার নজির বলে রায়ের দিন মন্তব্য করেছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। যারা এ নৃশংস হত্যাকান্ড ও অপকর্মের সাথে জড়িত তারাতো আবার মানুষ! মানুষ বলতে পশুরূপী মানুষ। এ কথিত মানুষগুলোর মধ্যে যে জিনিষটি যাকে বলে মনুষ্যত্ব সেটা চিরতরে লোপ পেয়েছে। সবচেয়ে বড় যে কারণটি আমি মনে করি, তা হল ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থাকা বড় কথা নয়। মানবিকতা, ন্যায়বিচার ও ধর্মীয় মূল্যবোধ অর্জনই মানুষের মনুষ্যত্ব লাভের মূল চাবিকাঠি। যার মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ নেই, তার আবার শিক্ষাগত যোগ্যতারই বা কী মূল্য আছে? একজন মানুষের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ থাকলে সে কখনো এ ধরণের ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হতে পারেনা। এ প্রসঙ্গে কবি কাহ্লিল যিবরানের কবিতার নিম্নোক্ত চরণ উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। কবি বলেন-

"তোমাদের সন্তানেরা, তোমাদের সন্তান নয়
তোমরা তাদের দিতে পার তোমাদের ভালবাসা
কিন্তু তোমাদের ভাবনা নয়
কেননা তাদের রয়েছে নিজস্ব ভাবনা।
তোমরা তাদের শারীরিক আশ্রয় দিতে পার বটে
কিন্তু আত্মাকে নয়
কেননা তোমাদের আত্মা থাকে
আগামী দিনের ঘরে"।

কবির উল্লিখিত চরণ হতে আমরা অন্ততঃ এটুকু শিখতে পারি যে, আমরা মানবজাতি হিসেবে মানব শিশুর প্রতি আমাদের আচরণ কী রকম হওয়া উচিৎ। আর বর্তমান সমাজে ঘটেছে তার উল্টোটাই। দেশের কর্তা/প্রশাসনের প্রতি আজ একটাই আকুতি, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষা করা। শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হউন। প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

উইকিপিডিয়া অনুযায়ী ধর্ষণ মানে হলো:

Rape is a type of sexual assault usually involving sexual intercourse, which is initiated

by one or more persons against another person without that person's consent.

বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনে ধর্ষণের সংজ্ঞা ও শাস্তির যেসব বিবরণ রয়েছে:

দন্ডবিধি ১৮৬০ – The Penal Code 1860: ধারা ৩৭৫-৩৭৬

A man is said to commit "rape" who except in the case hereinafter excepted, has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the five following descriptions:

Firstly. Against her will.

Secondly. Without her consent.

Thirdly. With her consent, when her consent has been obtained by putting her in fear of death, or of hurt.

Fourthly. With her consent, when the man knows that he is not her husband, and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married.

Fifthly. With or without her consent, when she is under fourteen years of age.

Explanation. Penetration is sufficient to constitute the sexual intercourse necessary to the offence of rape.

Exception. Sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being under thirteen years of age, is not rape.

376. Whoever commits rape shall be punished with 131[imprisonment] for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine, unless the woman raped is his own wife and is not under twelve years of age, in which case he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, 2000 এ রয়েছে:

৯। (১) যদি কোন পুরুষ কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা- যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত ২ [ষোল বৎসরের] অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া, অথবা

৩ [ষোল বৎসরের] কম বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ষণ বা উক্ত ধর্ষণ পরবর্তী তাহার অন্যবিধ কার্যকলাপের ফলে ধর্ষিতা নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন এবং ধর্ষণের ফলে উক্ত নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে বা তিনি আহত হন, তাহা হইলে ঐ দলের প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে-

(ক) ধর্ষণ করিয়া মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

(খ) ধর্ষণের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন

(৫) যদি পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে কোন নারী ধর্ষিতা হন, তাহা হইলে যাহাদের হেফাজতে থাকাকালীন উক্তরূপ ধর্ষণ সংঘটিত হইয়াছে, যেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ধর্ষিতা নারীর হেফাজতের জন্য সরাসরিভাবে দায়ী ছিলেন, তিনি বা তাহারা প্রত্যেকে, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, হেফাজতের ব্যর্থতার জন্য, অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

টিকা দুটিতে আছে: "ষোল বৎসরের" শব্দগুলি "চৌদ্দ বৎসরের" শব্দগুলির পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

ইসলামে ধর্ষণের সংজ্ঞা:

ইসলাম ধর্ষণকে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেনি। কারণ ইসলামে ধর্ষণ ভিন্ন কোনো অপরাধ নয়। বরং বিবাহবহির্ভূত যে কোনো যৌন সঙ্গমই ইসলামে অপরাধ। যাকে "যিনা" শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে।

যিনা সুস্পষ্ট হারাম এবং শিরক ও হত্যার পর বৃহত্তম অপরাধ। আল-কুরআনে আছে:

'এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে।'

কিন্তু যারা তাওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (ফুরকান, ৬৮-৭০)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।' (ইসরা, ৩২)

ইমাম কুরতুবী বলেন, "উলামায়ে কিরাম বলেন, যিনা করো না। এর চেয়ে যিনার কাছেও যেয়ো না অনেক বেশি কঠোর বাক্য।" এর অর্থ যিনার ভূমিকা যেসব বিষয়, সেগুলোও হারাম।

যিনার শাস্তি:

ইসলামে যিনার শাস্তি ব্যক্তিভেদে একটু ভিন্ন। যিনাকারী যদি বিবাহিত হয়, তাহলে তাকে প্রকাশ্যে পাথর মেরে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। আর যদি অবিবাহিত হয়, তাহলে তাকে প্রকাশ্যে একশত বেত্রাঘাত করা হবে। নারী-পুরুষ উভয়ের একই শাস্তি।

'ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।' (নূর: ২)

হাদীসে আছে,

'অবিবাহিত পুরুষ-নারীর ক্ষেত্রে শাস্তি এক শত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর। আর বিবাহিত পুরুষ-নারীর ক্ষেত্রে একশত বেত্রাঘাত ও রজম (পাথর মেরে মৃত্যুদন্ড)' (সহীহ মুসলিম)। এই হাদীস থেকে অন্য ফিক্বহের ফকীহরা বলেন, যিনাকারী অবিবাহিত হলে তার শাস্তি দুটো। (১) একশত বেত্রাঘাত, (২) এক বছরের জন্য দেশান্তর।

আর হানাফী ফকীহরা বলেন, এক্ষেত্রে হদ (শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি) হলো একশত বেত্রাঘাত। আর দেশান্তরের বিষয়টি ক্বাযী বা বিচারকের বিবেচনাধীন। তিনি ব্যক্তি বিশেষে তা প্রয়োগ করতে পারেন।

ধর্ষণের শাস্তি:

ধর্ষণের ক্ষেত্রে একপক্ষে যিনা সংঘটিত হয়। আর অন্যপক্ষ হয় মজলুম বা নির্যাতিত। তাই মজলুমের কোনো শাস্তি নেই। কেবল জালিম বা ধর্ষকের শাস্তি হবে।

ধর্ষণের ক্ষেত্রে দুটো বিষয় সংঘটিত হয়।

(১) যিনা, (২) বলপ্রয়োগ/ভীতি প্রদর্শন।

প্রথমটির জন্য পূর্বোক্ত যিনার শাস্তি পাবে। পরেরটির জন্য

ফকীহদের একটি অংশ বলেন, মুহারাবার শাস্তি হবে।

মুহারাবা হলো, পথে কিংবা অন্যত্র অস্ত্র দেখিয়ে বা অস্ত্র ছাড়াই ভীতি প্রদর্শন করে ডাকাতি করা। এতে কেবল সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হতে পারে, আবার কেবল হত্যা করা হতে পারে। আবার দুটোই হতে পারে।

মালেকী ফকীহরা মুহারাবার সংজ্ঞায় সম্ভ্রম লুট করার বিষয়টিও যোগ করেছেন। তবে সকল ফকীহ মুহারাবাকে পৃথিবীতে অনাচার সৃষ্টি, নিরাপত্তা বিঘ্নিত করণ, ত্রাস সৃষ্টি ইত্যাদি অর্থে উল্লেখ করেছেন।

মুহারাবার শাস্তি আল্লাহ এভাবে উল্লেখ করেছেন,

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি' (মায়িদা: ৩৩)।

এখানে হত্যা করলে হত্যার শাস্তি, সম্পদ ছিনিয়ে নিলে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেয়া, সম্পদ ছিনিয়ে হত্যা করলে শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করা- এরূপ ব্যাখ্যা ফকীহরা দিয়েছেন। আবার এর চেয়ে লঘু অপরাধ হলে দেশান্তরের শাস্তি দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

মোটকথা, হাঙ্গামা ও ত্রাস সৃষ্টি অপরাধের শাস্তি ত্রাস ও হাঙ্গামাহীন অপরাধের শাস্তি থেকে গুরুতর।

এ আয়াত থেকে বিখ্যাত মালেকী ফকীহ ইবনুল আরাবী ধর্ষণের শাস্তিতে মুহারাবার শাস্তি প্রয়োগের মত ব্যক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য, ধর্ষক যদি বিবাহিত হয়, তাহলে এমনিতেই তাকে পাথর মেরে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। কিন্তু সে বিবাহিত না হলে তাকে বেত্রাঘাতের পাশাপাশি বিচারক চাইলে দেশান্তর করতে পারেন। কিংবা অপরাধ গুরুতর হলে বা পুনরায় হলে অবস্থা বুঝে মুহারাবার শাস্তিও প্রদান করতে পারেন।

ইসলামের বিধানের আলোকে বাংলাদেশের ধর্ষণ আইনের পর্যালোচনা:

১. বাংলাদেশের আইনে ধর্ষণের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত ষোল বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া, অথবা ষোল বৎসরের কম বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

ইসলামের সাথে এই সংজ্ঞার তেমন কোনো বিরোধ নেই। তবে এতে কিছু অসামঞ্জস্যতা আছে। ইসলাম সম্মতি-অসম্মতি উভয় ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক মিলনকে দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু এই আইনে কেবল অসম্মতির ক্ষেত্রে তাকে অপরাধ বলা হয়েছে। সম্মতি ছাড়া বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ইসলাম ও দেশীয় আইন উভয়ের চোখে অপরাধ। আর সম্মতিসহ সম্পর্ক ইসলামে অপরাধ, দেশীয় আইনে নয়।

এটি নৈতিকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ককে সম্মতি সাপেক্ষে অনুমতি দেয়া হলে মানুষ বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে উৎসাহী হয়; তার চাহিদা বিস্তৃত হয়। পরে এক পর্যায়ে সে জোরপূর্বক তার চাহিদা মেটাতে সচেষ্ট হয়। আবার কোনো ক্ষেত্রে শুরুতে সম্মতি থাকলেও পরে ভিন্ন কোনো কারণে সম্মতি ছিল না বলে বলা হয়।

সম্মতি আর অসম্মতির বিভাজনরেখা খুব ঠুনকো। এর দ্বারা ধর্ষণ কখনোই রোধ করা সম্ভব নয়।

একই ব্যক্তি তার স্ত্রী ভিন্ন অন্য নারীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক করে যখন পার পেয়ে যাবে, তখন সে এক পর্যায়ে জোরপূর্বকও তা করবে। চাহিদাকে সীমিত না করে ধর্ষণ রোধ করার চিন্তা অমূলক।

পক্ষান্তরে ইসলাম মানুষের চাহিদাকে সীমিত করে দেয়। বিবাহ ছাড়া কোনো নারী-পুরুষ দৈহিক সম্পর্কে জড়িতে হলেই তাকে অপরাধ বলে গণ্য করে। কাজেই জোরপূর্বক করাকে অনুমোদন দেয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

২. আইনে সম্মতির বিষয়টি অপরাধের সীমা হওয়ায় ষোল বছরের বয়সের কথা বলা হয়েছে, যা পূর্বে চৌদ্দ বছর ছিল এবং পরে তা সংশোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ ষোল বছরের

কম কেউ সম্মতিক্রমে দৈহিক মিলন করলেও তা দন্ডনীয় অপরাধ হবে। এবং পুরুষ শাস্তি পাবে। তবে এক্ষেত্রে নারীর কোনো শাস্তি হবে না। (অবশ্য আইনে নারীর কোনো অবস্থায়ই শাস্তি হওয়ার কথা না। ধর্ষণ হলে তো নয়ই। ধর্ষণ না হলেও নয়। কারণ ধর্ষণ না হয়ে সম্মতিক্রমে হলে কারোরই শাস্তি হবে না।) পক্ষান্তরে ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট বয়স উল্লেখ করেনি। বরং বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক সম্পর্ককেই যিনা বলেছে, যা দন্ডনীয় অপরাধ। এক্ষেত্রে নারীর সম্মতি থাকলে সেও শাস্তি পাবে। নতুবা পাবে না। তবে ইসলামে যে কোনো বিধান প্রযোজ্য হওয়ার জন্য বালিগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া জরুরী। আর বালিগ হওয়ার বয়স ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন হতে পারে। স্বেচ্ছায় সম্মতিতে কেউ বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক করলে তাকে বালিগই ধরা হবে। কাজেই তার ওপরও শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

৩. আইনে ধর্ষণের কারণে মৃত্যু না হলে তার মৃত্যুদন্ড নেই। কেবল যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড। পক্ষান্তরে ইসলামে বিবাহিত কেউ ধর্ষণ বা যিনা করলে তার শাস্তি রজম বা পাথর মেরে মৃত্যুদন্ড।

আইনে ধর্ষণের কারণে মৃত্যু হলে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর ইসলামে ধর্ষণের কারণে মৃত্যু হলে সে প্রথমে যিনার শাস্তি পাবে। পরে হত্যার শাস্তি পাবে। হত্যা যদি অস্ত্র দিয়ে হয় তাহলে ক্বিসাস বা মৃত্যুদন্ড। আর যদি অস্ত্র দিয়ে না হয়, এমন কিছু দিয়ে হয় যা দিয়ে সাধারণত হত্যা করা যায় না, তাহলে দিয়ত বা অর্থদন্ড, যার পরিমাণ একশত উটের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ (প্রায় কোটি টাকা)।

ধর্ষণের সাথে যদি আরো কিছু সংশ্লিষ্ট হয়, যেমন ভিডিও ধারণ, তা প্রচার ও প্রসার ইত্যাদি, তাহলে আরো শাস্তি যুক্ত হবে।

ইসলামে ধর্ষণ প্রমাণ করা:

যিনা প্রমাণের জন্য ইসলামে দুটোর যে কোনোটি জরুরী। (১) ৪ জন সাক্ষী, (২) ধর্ষকের স্বীকারোক্তি।

তবে সাক্ষ্য না পাওয়া গেলে আধুনিক ডিএনএ টেস্ট, সিসি ক্যামেরা, মোবাইল ভিডিও, ধর্ষিতার বক্তব্য ইত্যাদি অনুযায়ী ধর্ষককে দ্রুত গ্রেফতার করে স্বীকার করার জন্য চাপ দেয়া হবে। স্বীকারোক্তি পেলে তার ওপর শাস্তি কার্যকর করা হবে।

ইসলামে ধর্ষণ ও যিনা, তথা সম্মতি ও অসম্মতি উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষের শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। তবে নারীর ক্ষেত্রে ধর্ষিতা হলে কোনো শাস্তি নেই, সম্মতিতে হলে শাস্তি আছে। যৌন অপরাধ নির্ণয়ে ইসলাম নির্ধারিত বিভাজনরেখা (বিবাহিত-অবিবাহিত) সর্বোৎকৃষ্ট।

বাংলাদেশের আইনে যতটুকু শাস্তি রয়েছে তা প্রয়োগে প্রশাসনের অবহেলা আর বিভিন্ন রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক চাপ প্রয়োগে ধর্ষণের উপযুক্ত শাস্তি হয় না। উপরন্তু ধর্ষিতাকে একঘরে করে রাখা হয়, তাকে সমাজে বাঁকা চোখে দেখা হয়। তার পরিবারকে হুমকি-ধমকি দেয়া হয়। এগুলো কোনোটিই ইসলাম সমর্থন করে না। ইমাম-খতীব-মুহাদ্দিস-মুফাসসির-মুফতী-ওয়ায়িয সবারই এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নিম্নোক্ত কবিতার চরণ দিয়ে শেষ করছি এ প্রবন্ধ:

"ভিক্ষা দাও, পুরবাসী ভিক্ষা দাও।
তোমাদের একটি সোনার ছেলে ভিক্ষা দাও।
আমাদের এমন একটি ছেলে দাও
যে বলবে আমি ঘরের নই,
আমি পরের।
আমি আমার নই, আমি দেশের"।

সহযোগী সূত্র:

১. পবিত্র কুরআন ও হাদিস গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত (সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীস)

২. দি হিস্ট্রি অব ইসলাম - সৈয়দ আমীর আলী

৩. উইকিপিডিয়া

৪. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, 2000 : ধারা 9

৫. দন্ডবিধি ১৮৬০ The Penal Code 1860 : ধারা 375, 376

ইসলামে শব-ই-বারাআত উদ্‌যাপন নতুন সংযোজন নয়

• মাওলানা মুহাম্মদ মিশকাত •

ভূমিকা:

সুশৃঙ্খল পৃথিবীর আবর্তনে এক মহাশক্তির নির্দেশনা সর্বত্র বিদ্যমান। যার সঞ্চালক সকলের স্রষ্টা এক আল্লাহ্। তাঁরই নির্দেশে নির্ধারিত বারটি মাস। প্রত্যেক মাস ধারাবাহিকভাবে মহিমান্বিত হয়ে পৃথিবী আবর্তন করে। রজব, শা'বান ও রামদ্বান বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত মাস। রজবে আছে খাজা গরীবে নাওয়ায (রহ.)-এর ওফাত ও শবে মি'রাজ। শা'বানে শবে বারাআত এবং রামদ্বানে রোযা, সাহরী, ইফতার, কুরআন তিলাওয়াত, দান-সাদক্বাহ্ ইত্যাদি। ভারতীয় উপমহাদেশে তথা পুরো অনারবে শা'বান মাসের পনের তারিখ শবে বারা'আত হিসেবে প্রসিদ্ধ। আর আরবে লাইলাতুল বারাআত বা লাইলাতুল নিস্‌ফি মিন শা'বান বলা হয়।

শব-ই-বারাআতের ব্যাখ্যা:

ফার্সি শব অর্থ রাত। আর বারাআত অর্থ ভাগ্য। আরবীতে লাইলাতুল বারাআত। "লাইলাতুল বারাআত নামকরণের তাৎপর্য হল, এ রাতে দু'ধরনের বারাআত বা সম্পর্কচ্ছেদ হয়। অপরাধীরা আল্লাহ্ তা'আলার রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে। আর আল্লাহ্‌র ওলীরা পার্থিব অপমান-লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত হয়ে যান"। (গুনিয়াতুত্ তালিবীন, পৃ: ৩৬৫)।

যেহেতু এ রাতে মানুষের জন্ম-মৃত্যু ও রিযিকের বার্ষিক বাজেট নির্ধারিত হয়। এ অর্থে এ রাতকে ভাগ্য নির্ধারণ রাতও বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে শব-ই-বারাআত বলতে বুঝায় "শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত যে রাতে ফেরেশ্‌তারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে মানুষের বয়স ও রিযিক বন্টন করে থাকেন"। (দেহ্ খুদা অভিধান পৃ. ১৯৮)।

কুরআনের দলিলের ভিত্তিতে শব-ই-বারাআত:

পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনে লাইলাতুল বারাআত সরাসরি উল্লেখ নেই। তবে লাইলাতুল মুবারাকা আছে। যা মুফাস্‌সিররা শব-ই-বারাআত বলেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

انا انزلناه فى ليلة مباركة انا كنا منذرين - فيها يفرق كل امر حكيم - امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السميع العليم -

অর্থাৎ, আমি একে (কুরআন মাজীদকে) নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থির হয় আমার আদেশে। আমি (ফেরেশ্‌তাদের) প্রেরণকারী, আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা দুখান : ৩-৬)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সির হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মতে, লাইলাতুল মুবারাকা দ্বারা চৌদ্দ-ই শা'বান দিবাগত রাত তথা শব-ই-বারাআতকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন:

قال ابن عباس رضى الله عنهما حٰمٓ يعنى قضى الله ما هو كائن الى يوم القيامة والكتاب المبين يعنى القران فى ليلة مباركة هى ليلة النصف من شعبان وهى ليلة البركاة

হা-মীম। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন যা ঘটবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এবং সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ। অর্থাৎ আল-কুরআন, লাইলাতুল মুবারাকা। তা হল শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত। আর তা-ই লাইলাতুল বারাআত। (তাফ্‌সীরে দুররে মনসূর, খ-৭, পৃ. ৪০১)।

এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদে মুবারাকা বা বরকতময় বলার কারণ কী? এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) বলেছেন-

الليلة المباركة كثيرة خيرها وبركتها على العالمين فيها الخير وان كان بركات جمالة تعالى تصل الى كل ذرّة من العرش الى الثرىٰ كما فى ليلة القدر

অর্থাৎ- লাইলাতুল মুবারাকা এ জন্য বলা হয় এ রাতে খায়ের ও বরকত নাযিল হয়। সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্‌র সৌন্দর্যের বরকত আরশের প্রতি কণা থেকে ভূ-তলের গভীরে পৌঁছে শব-ই-ক্বদরের মত। (তাফসীরে রূহুল বায়ান, খ-৮, পৃ. ৪০১)।

হাদীসের আলোকে শব-ই-বারাআত:

শব-ই-বারাআত সম্পর্কে নবীজী (দ.)-এর বহু বাণী ও আমল হাদীসের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়। শব-ই-বারাআতে আল্লাহ্ তা'আলা কল্যাণের দরজা খুলে দেন। যেমন হযরত

আয়িশাহ্ (রাদ্বি.) বলেন-

قالت سمعت النبى ﷺ يقول يفتح الله الخير فى اربع ليال - ليلة الاضحى والفطر وليلة النصف من شعبان ينقسم فيها الاجال والارزاق ويكتب فيها الحاج وفى ليلة عرفة الى الاذان -

আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, চার রাতে আল্লাহ্ পাক কল্যাণের দরজা খুলে দেন। ঈদুল আদ্বহা (কুরবানী ঈদের রাত), ঈদুল ফিতর রাত, শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত। (যে রাতে মৃতের তালিকা তৈরি হয়, রিযিক নির্ধারিত হয় এবং হজ্বব্রত পালনকারীদের তালিকা তৈরি হয়।) আরাফার রাত (৮ যিলহজ্ব দিবাগত রাত) ফজরের আযান পর্যন্ত। (সুনানে ইবনে মাজাহ-পৃ. ১০০)

এছাড়া হযরত আলী (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان الله عز وجل ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول الامستغفر فاغفر له الا مبتلى فاعا فيه الا مسترزق فارزقه الاكذا الا كذا حتى يطلع الفجر وفى رواية حتى تطلع الشمس -

অর্থৎ, যখন শা'বানের চৌদ্দ তারিখ আসবে, সে রাতে তোমরা ক্বিয়াম করবে (ইবাদতে কাটাবে) এবং দিনে রোযা রাখবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ রাতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কেউ আছ কি? ক্ষমা চাইলে আমি গুনাহ্ ক্ষমা করে দেব। কেউ রোগগ্রস্ত আছ কি? (রোগমুক্তি প্রার্থনা করলে) আমি আরোগ্য দান করব। কেউ রিযিক চাওয়ার আছ কি? আমি রিযিক দেব। কেউ আছ কি? এভাবে ফজর পর্যন্ত ঘোষণা আসতে থাকে। কোনো কোনো বর্ণনামতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এ ঘোষণা চলতে থাকে।

(ইবনু মাজাহ্, খ-১, পৃ. ৪৪৪, হাদীস- ১৩৮৮। মিসবাহুস জুযাযাহ, আল্লামা কিনানী, খ-২, পৃ. ১০। তারগীব ওয়াত তারহীব, খ-২, পৃ. ৭৫, হাদীস- ১৫৫)

শব-ই-বারাআতে যে পন্থায় ইবাদত উত্তম:

ক. শব-ই-বারাআতে ইবাদতের মধ্যে নফল নামায আদায় করা বেশি উত্তম। এ নামাযের সর্বোচ্চ নির্ধারিত কোনো রাকাআত নেই। যে যত অধিক পড়বে তার সাওয়াবও তত বেশি হবে। তবে কমপক্ষে বার রাকাআত পড়া সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে।

মহানবী (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে (শবই-বারাআতে) বার রাকাআত নামায আদায় করবে এবং এর প্রতি রাকাআতে একবার সূরা ফাতিহা ও দশবার সূরা ইখলাস পড়বে আল্লাহ্ তা'আলা-এর বদৌলতে তার জীবনের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তার উপর বারাকাত দান করবেন।

খ. এ রাতে অপর করণীয় আমল কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা। যেহেতু কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণে এ রাতের এত মর্যাদা। তাই তিলাওয়াত ও মর্মার্থ অনুধাবন করা এ রাতের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

গ. আল্লাহ্ তা'লার যিক্র করা, বিভিন্ন তাসবিহ্ আদায়ের মাধ্যমে।

ঘ. এ রাতের আরেকটি উত্তম কাজ হল নবীজীর (দ.) উপর বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়া।

ঙ. শরী'আতসম্মত পন্থায় মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজন আল্লাহ্র ওলীদের মাযার যিয়ারত করা। আল্লাহ্র রাসূল (দ.) এ রাতে জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত সাহাবায়ে কিরাম-এর মাযার যিয়ারত করেছেন। (তিরমিযী, খ-১, পৃ.১৫৬ ও মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ.১৪৫)

চ. ফক্বীর মিসকিনকে দান খয়রাত করা। সাদক্বার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মুসীবত দূর করে দেন।

ছ. একনিষ্ঠ অন্তরে তাওবা করে নিজের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন বিশেষ করে মা-বাবা, উস্তাদ, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, দেশবাসী ও মযলুম মুসলমানের জন্য দু'আ করা। (সহীফায়ে ক্বাদিরিয়া, পৃ.৩৯৩)।

শব-ই-বারাআতের ফযীলত:

১. এ রাতে পরবর্তী বছরের সমস্ত সৃষ্টির পরিকল্পনা অনুমোদন দেয়া হয়।

২. এ রাতে ইবাদত-বন্দেগী কবুল করা হয়।

৩. এ রাতের উসিলায় আল্লাহ্ আপন বান্দাহ্কে বিশেষ ক্ষমা প্রদান করেন।

৪. এ রাতে আল্লাহ্র হুকুমে মানুষের আমলসমূহ করা হয়।

৫. এ রাতে মানুষের এক বছরের রিযিক নির্ধারিত হয়।

৬. এ রাতে পরবর্তী এক বছরের মৃত্যুবরণকারী এবং জন্মগ্রহণকারীদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়।

৭. এ রাতে যমযমের পানি সুমিষ্ট হয়।

৮. এ রাতে বনী কিলাব গোত্রের ছাগলের পালে যত লোম আছে, তার চেয়েও অধিক বান্দাহকে ক্ষমা করা হয়। কথিত আছে যে, সেই গোত্রের ছাগলের সংখ্যা বিশ হাজারেরও বেশি ছিল।

যারা ক্ষমার অযোগ্য:

মুশরিক তথা যারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন মূর্তিকে শরীক করে। যাদুকর তথা যাদু কাজে যে ব্যক্তি লিপ্ত। অর্থাৎ সামান্য টাকায় যারা যাদুমন্ত্র দ্বারা অন্যের ক্ষতি সাধনে চেষ্টা চালায়। যিনাকার তথা যে সকল পুরুষ বা নারী যিনায় লিপ্ত হয়। সুদ তথা যে ব্যক্তি সুদ খায় এবং দেয়, আর যে সাক্ষী হয় সবাই হারামে লিপ্ত। মাদকদ্রব্য তথা মাদকদ্রব্যের সাথে জড়িত ব্যক্তি। গণক তথা মানুষের ভাগ্য গণনাকারী এবং যে এ কাজ বিশ্বাস করে উভয় সমান অপরাধে অপরাধী। মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী তথা যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মকেন্দ্রীক জীবন যাপন করে এবং আত্মীয়ের হক আদায় করে না এবং মাশাহেন তথা যে সব লোকের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে এরূপ নয় প্রকার লোকের দু'আ বারাআতের রাতে কবূল হয় না। যদি তারা পবিত্র মনে তাওবাতুন নাসুহা তথা একনিষ্ঠ তাওবাহ করে।

যে সব কাজ বর্জনীয়:

শব-ই-বারাআত হল পবিত্রময় রাত। এ রাতে অনেকে অর্থ অপব্যয় করে আতশবাজি ফাটায়, ইসলাম এ অপচয় সমর্থন করে না। ইবাদতের বাহানায় ঘর থেকে বের হয়ে গাড়ি নিয়ে এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করে ফযর পর্যন্ত সময় নষ্ট করা চরম দোষনীয়। পুরো রাত জাগ্রত থেকে ফজরের নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়া মারাত্মক গুনাহ্।

শব-ই-বারাআতের সামাজিক গুরুত্ব:

ইসলাম ধর্ম সর্বকালের জন্যই সর্বাধুনিক। এ ধর্মে সংস্কৃতিরও কমতি নেই। মুসলমানরা যদি ঈদ-ই মীলাদুন্নবী (দ.), পবিত্র আশুরা, শব-ই-মিরাজ, শব-ই-বারাআত, জুমা'আ, ঈদ, রামদ্বান, উরস, ফাতিহা ইত্যাদি যৌথভাবে সুন্দররূপে পালন করত, অমুসলিমরাও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হত। এছাড়া যে যুবককে শত চেষ্টা করেও মসজিদে আনা যায় না, সে শব-ই-বারাআতে নতুন পোষাকে মসজিদে হাযির হয় এবং আলিম সমাজের ওয়াজ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে শোনে, অন্যায় অশ্লীলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার প্রতিজ্ঞা করে এবং বুযুর্গানে দীনের জীবনী শুনে এতে তার মনে দীনী চেতনা জাগে। শেষ রাতে সবার সাথে দু'হাত তুলে মুনাজাত করে। এ সব থেকে কোন অবস্থাতেই এ পবিত্র অনুষ্ঠানকে খাটো করে দেখা যায় না। এছাড়া যে সব দেশে ইহুদী চক্রান্তের কারণে দীনী চেতনা সৃষ্টিকারী অনুষ্ঠানকে নানা ফাতওয়া দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে, সে সব দেশের যুবকদের মাঝে এ চেতনা দেখা যায় না। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। যেন, ইহুদী চক্রের মিথ্যা বানোয়াট ফাতওয়ায় আমাদের শব-ই-বারাআতের ন্যায় অত্যধিক ফযীলতপূর্ণ রজনী থেকে বিমুখ করতে না পারে।

শব-ই-বারাআতের শিক্ষা ও তরীকৃতপন্থীদের করণীয়:

শব-ই-বারাআত থেকে আমাদের অনেক অনুকরণীয় বিষয় আছে। বিশেষত তরীকৃত পন্থীদের জন্য। আপন মুর্শিদের দরবারে হাযিরা দেওয়া। ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকা। সম্মিলিতভাবে মাযার জিয়ারত করা। গরীব নিঃস্বদের মুখে অন্তত এক বেলার খাবার তথা হালুয়া-রুটি তুলে দেওয়া। সর্ব প্রকারের নীতিগর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার শপথ নেওয়া। মানবপ্রেম ও মানবকল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা এবং সেই মানুষের অপরাধ ভুলে যাওয়া যে আপনার ক্ষতি করেছে। সকল ধর্মের মানুষের মাঝে এক আদমের গুণ মিশ্রণ ঘটিয়ে একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের বিধানমত শব-ই-বারাআতের শিক্ষা ও দর্শনের বিকাশ ঘটা।

উপসংহার:

বছর ঘুরে বারাআত যদিওবা এক দিনের অনুষ্ঠান। কিন্তু এর প্রভাব ও তাৎপর্য পুরো বছর জুড়ে থাকবে, যদি এর সদ্ব্যবহার করা যায়। মাইজভাণ্ডারী দর্শনে এর যথাযথ প্রয়োগ বিদ্যমান এবং তা বেগবান হয়ে থাকবে তরীকৃতপন্থীদের অগ্রণী ভূমিকায়।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা

• মাওলানা নেজাম উদ্দীন চিশ্‌তী •

ইসলাম শব্দটি 'সিলমুন' শব্দ থেকে উৎপত্তি। এর অর্থ শান্তি। মুসলিম শব্দের অর্থ শান্তিকামী। ইসলাম ধর্ম শান্তির ধর্ম, মানবতার ধর্ম। মহান আল্লাহ তা'আলা বিশ্বমানবজাতির শান্তি, স্বস্তি, উন্নতি, প্রগতি ও নিরাপত্তার জন্য যে ঐশী বিধানাবলী দান করেছেন এর সমষ্টির নামই ইসলাম। যুগে যুগে দেশে দেশে আল্লাহর মনোনীত নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কিরাম, আউলিয়ায়ে এজামদের অক্লান্ত ত্যাগ ও আদর্শের বিনিময়ে ইসলামের বাণী প্রচারিত হয়েছে। বিশ্বমানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধনে ইসলামের বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব কালজয়ী। কেবল ইসলামী আদর্শানুসারী লেখক, গবেষক বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিকরা নন অমুসলিম জ্ঞানী-গুণী দার্শনিক বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত অকুণ্ঠ চিত্তে ইসলামী আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব ইসলামের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র মহানত্ব বিশ্বসভ্যতায় মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে স্বীকারোক্তি প্রকাশ করেছেন। ইসলামের সর্বজনীনতা, বিশ্বজনীন আদর্শ, কালোত্তীর্ণতা প্রশ্নাতীত। অথচ পরিতাপের বিষয়, সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ ইসলাম আজ আলোচিত-সমালোচিত। ইসলামকে নিয়ে আজ বিতর্কের অন্ত নেই। ইসলামের সূচনাকাল হতে অদ্যাবধি ইসলাম বিদ্বেষী, কাফির-মুশরিক ইয়াহুদী-নাসারা খোদাদ্রোহী নাস্তিক বাতিল অপশক্তিগুলো সর্বদা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ, ইসলামী চেতনার মূলোৎপাটন সর্বোপরি ইসলামী আদর্শ নির্মূলের অপচেষ্টায় সর্বদা সক্রিয় আছে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কালক্রমে ষড়যন্ত্রের সেই অশুভ তৎপরতা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য এক শ্রেণীর ইসলাম নামধারী ইসলাম বিকৃতকারী কুরআন সুন্নাহর অপব্যাখ্যাকারী বর্ণচোরা মুনাফিক চক্রের ইসলামের নামে ইসলাম বিরোধী কর্মপদ্ধতি রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ও কর্মসূচী প্রতিষ্ঠিত ইসলামের সমুন্নত মর্যাদায় আঘাত হেনেছে, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে ম্লান করে দিয়েছে, ইসলামের সমুজ্জ্বল ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। ইসলাম মানে সন্ত্রাস, মুসলমান মানে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ হিসেবে প্রচার করার সুযোগ করে দিয়েছে। ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদেরকে ধর্মান্ধ মৌলবাদী সন্ত্রাসী, জঙ্গিবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার ও অপবাদে অভিযুক্ত করার সুযোগ নিয়েছে। যাদের কারণে আজ এ অবস্থার সৃষ্টি তারা আজ চিহ্নিত, তারা ইসলামের নামে কলঙ্ক, তারা দেশ ও জাতির শত্রু, মানবতার শত্রু, ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু, ইসলামী রাজনীতির আড়ালে যারা সন্ত্রাস করে ও সন্ত্রাসী লালন করে তারা মুসলমান হতে পারে না। মুসলমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله ﷺ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (رواه البخارى)

অর্থাৎ: হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার জিহ্বা ও হাত হতে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে সেই-ই মুসলমান। (বুখারী শরীফ, মিশকাত শরীফ, পৃ. ১২) সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা অজ্ঞতা ও মুর্খতার পরিচায়ক। আল্লাহর আইন চালু করার মাধ্যমে ইসলামী শাসনতন্ত্র বাস্তবায়নের নামে মানুষ হত্যা করা নৈরাজ্য ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা, লোকালয়ে, যানবাহনে, বিচারালয়ে, আদালতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা করে মানুষ হত্যা করা জঘন্যতম অমার্জনীয় অপরাধ। যারা এসব অপকর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে তারা প্রায় মূর্খ অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত, কর্মহীন বেকার বুদ্ধি বিবেচনাহীন। এ অপকর্মের পরিকল্পনাকারীরা বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অথচ এসব কর্ম পদ্ধতির সাথে ইসলামে দূরতম সম্পর্কও নেই।

সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদের কোন সুনির্দিষ্ট জীবনদর্শন নেই। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল ও আতঙ্কগ্রস্ত করে রেখে পার্থিব সম্পদ অর্জন, ক্ষমতা দখল ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে দেশ-বিদেশে পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা। বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত থেকে দেখা যায়, যারা সরাসরি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত এবং হত্যা, খুন ও বোমা হামলা চালিয়ে থাকে তারা নিজেরাও জানেনা কী উদ্দেশ্যে তারা এ কাজটি করছে।

অনেক ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসের কেন্দ্রবিন্দুতে যারা অবস্থিত তাদের সম্পর্কে সঠিকভাবে কোন তথ্য পাওয়া যায়না। কিন্তু দেখা যায় কোথাও কোন বড় ধরনের বোমাবাজি বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলে কোন কোন গোষ্ঠী বিবৃতি দিয়ে এটি তাদের কাজ বলে গণমাধ্যমগুলোতে ফলাও করে প্রচার করে নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানান দেয়। আর যে নিরীহ বোমাবাজরা ধরা পড়ে তারা বিবৃতি শোনার পরেই কেবল জানতে পারে তারা কাদের হয়ে এ কাজটি সংঘটিত করেছে।

ধর্মের নামে সন্ত্রাস: এটি অস্বীকারের উপায় নেই যে, বিশ্বের অনেক দেশেই ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বের অনেক সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য বিভিন্ন ধর্মের নাম ব্যবহার করে থাকে। এ ক্ষেত্রে পবিত্র ধর্ম ইসলামের নামও ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এর সাথে ইসলামের কোন দূরতম সম্পর্কও নেই। ইসলাম সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে কখনোই প্রশ্রয় দেয় না। ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন সমগ্র বিশ্বের রহমত বা শান্তির দূত হিসেবে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী সমাজ-আইয়ামে জাহেলিয়াতের নিকষ কালো অন্ধকার থেকে মানব জাতিকে উদ্ধার করে উপহার দিয়ে গেছেন একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ কাঠামো। যেখানে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও হানাহানির কোন স্থান ছিলনা। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও কৃষ্টি নির্বিশেষে সকল মানুষের শান্তি নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাহমাতুল্লিল আলামীন রূপে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন। কাজেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচারিত দীন ইসলামে যে সন্ত্রাসের নূন্যতম স্থানও থাকতে পারেনা এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে তারা যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষা ও আদর্শ থেকে অনেক দূরে এটা অনস্বীকার্য।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কারণ: সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: ধর্ম সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞানের অভাব বা অজ্ঞতা, দূর্বল ঈমান ও তাকওয়ার অভাব, চারিত্রিক বিভিন্ন ত্রুটি, নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লোভ, স্বৈরাচারী ও একনায়ক চরিত্রের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী কর্তৃক নিরীহ জনগণকে অত্যাচার এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের উপর অকথ্য নির্যাতন, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, বেকারত্ব দেশ ও জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাব ইত্যাদি।

ক. ধর্ম সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞানের অভাব: ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তারা খুবই স্বল্প শিক্ষিত এবং কুরআন ও হাদীসের সঠিক আক্বীদা, সঠিক চিন্তাদর্শন ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ধর্মের নামে যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয় তারা কুরআনের কয়েকটি আয়াত ও কয়েকটি হাদীসের ভুল ব্যাখ্যার শিকার। সন্ত্রাসীদের মূল হোতারা সেগুলোকেই তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

খ. দূর্বল ঈমান ও তাকওয়ার অভাব: একজন মুমিন বান্দার কী করনীয়, মানুষ ও সমাজের প্রতি তার কী দায়বদ্ধতা রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কী দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন এসব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান না থাকায় এবং দূর্বল ঈমান ও তাকওয়ার অভাবে তারা অনেক সময়েই সহজ পন্থায় পরকাল লাভের প্রত্যাশায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়। তাদের মন-মগজে এ ভ্রান্ত বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয়া হয় যে, সমাজে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে হলে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। কাজেই তারা জীবনকে তুচ্ছ মনে করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আত্মহত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করেনা।

গ. চারিত্রিক বিভিন্ন ত্রুটি: ভোগ বিলাসের প্রতি সীমাহীন আসক্তির কারণেও অনেকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়। চারিত্রিক ত্রুটির কারণে অনেকেই মাদকাসক্তিতেও জড়িয়ে পড়ে এবং মাদকের অর্থ যোগানোর জন্য তারা কোন নীতি নৈতিকতার তোয়াক্কা না করে সন্ত্রাসের ক্রীড়নকে পরিণত হয়।

ঘ. নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লোভ: যোগ্যতা, মেধা, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও সমাজের মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধের আদর্শ না থাকা সত্ত্বেও মানুষকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে সহজ পন্থায় ক্ষমতা ও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা

করা হয়ে থাকে। এভাবে নেতৃত্বের লোভ, একগুয়েমী, মেজাজের ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি চারিত্রিক ত্রুটি সন্ত্রাসের জন্ম দিয়ে থাকে।

ঙ. অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ও বেকারত্ব: অনেক সময় দারিদ্র্য মানুষকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়। ফলে লোকেরা অর্থ উপার্জনের নেশায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়। সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে বেকারত্ব। শিক্ষিত বেকার যুব সমাজ তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মের সুযোগ না পেয়ে হতাশগ্রস্ত হয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে।

চ. দেশ ও জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাব: দেশ ও জাতির সমুন্নত অতীত ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণেও অনেকেই সন্ত্রাসবাদের হোতাদের প্ররোচনায় নিজেদের ভূখণ্ড এবং তাদের ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোর উপরও আঘাত হানতে কুণ্ঠাবোধ করেনা। সন্ত্রাসীরা অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা ও ইতিহাস ঐতিহ্যের পীঠস্থানগুলোর উপর বোমা হামলা চালিয়ে সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। দেশ ও জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যের মূল্য সম্পর্কে তাদের সম্যক ধারণা না থাকার কারণে তারা নিমিষেই এসব স্থাপনা ধ্বংস করতে দ্বিধাবোধ করেনা।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলামের শিক্ষা: ইসলামে নির্বিচারে মানুষ হত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ইসলামের দৃষ্টিতে কাউকে হত্যা করা বা মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ৫টি বৈধ কারণ রয়েছে, ১. কাউকে হত্যা করার অপরাধ করলে, ২. ডাকাতি করাকালে মানুষ হত্যা করলে, ৩. রাষ্ট্র ও বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করলে, ৪. ইসলাম পরিত্যাগ করলে, ও ৫. বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হলে। এসব কারণে প্রত্যেক জাতি বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি দিয়ে থাকে। কিন্তু শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের নয়। সন্ত্রাসীরা যদি নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য রাষ্ট্রের এ দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেয় তাহলে তারা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর নির্দেশকেই অমান্য করে। কাউকে বিনাবিচারে হত্যার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার সতর্কবাণী হচ্ছে,

من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكانّما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا۔

"কেউ কাউকে নরহত্যার অপরাধ ব্যতীত হত্যা করলে সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করলো। আর কেউ কারো প্রাণ বাঁচালে সে যেন গোটা মানব জাতিকে বাঁচালো" (সূরা মায়িদা, আয়াত: ৩২) ফিতনা বা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

والفتنة اشدّ من القتل

"ফিতনা বা সন্ত্রাস হত্যার চেয়েও ভয়াবহ" (সূরা বাকারা, আয়াত, ১৯১)

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب۔

"তোমরা এমন ফিতনা বা সন্ত্রাসকে ভয় কর, যে ফিতনা বা সন্ত্রাস তোমাদের মধ্যে যারা জালিম শুধু তাদেরকে পিষ্ট করবেনা (তোমাদেরও পিষ্ট করবে) এবং জেনে রেখ! নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর"। (সূরা আনফাল, আয়াত: ২৫)

ظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت ايدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون۔

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে তাদের কোন কোন কৃতকর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।" (সূরা রূম, আয়াত ৪১)।

ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وّطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين۔

"দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনের পর সেখানে বিপর্যয় বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করোনা তাঁকে (আল্লাহকে) ভয় ও আশার সাথে ডাকবে। আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী" (সূরা আরাফ, আয়াত ৫৬)। পৃথিবীর কোথাও এসব ঘৃণ্য পন্থায় ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটেছে এমন কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামের শত্রুরাও দেখাতে পারবেনা। হযরাতে আম্বিয়া-ই কিরাম, সাহাবা-ই কিরাম, তাবিয়ীন, তাব'য়ে তাবিয়ীন, সালফি সালিহীন, বুযুর্গান-ই দ্বীন, আউলিয়ায়ে কামিলীন হাক্কানী রাব্বানী পীর মাশাইখ এবং ব্যবহারিক জীবনের আদর্শ ও চারিত্রিক গুণে তাদের চিত্তাকর্ষক হৃদয়গ্রাহী মনমুগ্ধকর মানবতাবাদী কল্যাণধর্মী সৌন্দর্যের কারণেই ইসলামী আদর্শের প্রচার প্রসার ঘটেছে। মহান আল্লাহ পাক মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন,

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن۔

"(হে রসূল) আপনি আপনার প্রভুর পথে মানুষদের প্রজ্ঞা ও

সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান করুন, (কখনো তর্কে যেতে হলে) এমন পদ্ধতিতে যুক্তিতর্ক করুন যা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পন্থা।" (সূরা নাহল, আয়াত ১২৫)।

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذ اخاطبهم الجهلون قالوا سلما

"রহমান এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম।" (সূরা ফুরকান, আয়াত ৬৩)

আজ এক শ্রেণীর উগ্রবাদী বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠী ইসলামের নাম ব্যবহার করে সন্ত্রাসী পথ বেছে নিয়েছে বা ইসলাম কায়েমের স্বপ্ন দেখছে। এসব সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদের জন্মদাতা কারা? তাদের যোগসূত্র ও সম্পর্ক কাদের সাথে? সচেতন মুসলমান জাতি ইতিমধ্যে জানতে পেরেছে তারা সত্যিকার মুসলমান নয়। সত্যিকার মুমিন মুসলমানের জীবনী পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই তাঁদের কাছে এসে চোর কুতুবে পরিণত হয়। ডাকাতের দল আউলিয়া হয়, সন্ত্রাস করতে এসে ঈমানদারে পরিণত হয়। সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) ভারতবর্ষে তশরিফ আনার পর আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে পৃথ্বিরাজের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ অভিজাত নির্বিশেষে খাজা বাবার (রা.)'র শিষ্যত্ব বরণ করতে থাকলে দাম্ভিক রাজার কর্তৃত্বের বিস্তৃতি সংকোচিত হতে শুরু করে। খাজা বাবার (রা.) রূহানী শক্তির কাছে বারবার পরাজয়ে রাজা নীরব হলেও খাজাকে আজমীর হতে বের করে দেওয়ার গোপন ষড়যন্ত্র ছাড়েনি। এ ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় রাজা আপন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে পাঠাল, খাজাকে হত্যা করতে। দুষ্ট রাজকর্মচারী জামার ভিতরে ধারালো ছোরা নিয়ে ইসলাম গ্রহণের জন্য আগত মানুষদের সাথে খাজার সমীপে উপস্থিত হল। দেখা মাত্র খাজা বললেন, বাবা! তুমি মুসলিম হতে আসনি, জামার ভিতর ছুরি নিয়ে আমাকে হত্যা করতেই এসেছ। এতে বিস্মিত হয়ে লোকটি 'আপনি অন্তরের খবর জ্ঞাত, সত্যিই আপনি হৃদয়রাজ্যের রাজা, হিন্দুস্থানে আপনার কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত, আমাকে শিষ্যত্বে বরণ করুন বলে কদমে লুটে পড়ল। রাজার সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলে সে খাজার ভক্তদের নির্যাতন নিপীড়ন করতে শুরু করল। খাজার খেদমতে এক মুরীদ রাজার অসহনীয় নির্যাতনের নালিশ করলে খাজা (রা.) লোক মারফত রাজাকে মুসলিমদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। এতে ক্ষিপ্ত রাজা বলল, 'এ ফকীর এখান থেকে চলে গেলে কতই মঙ্গল হতো।' রাজা তাঁকে একথা বলতে রইল। এ সংবাদ খাজা (রা.)'র কর্ণগোচর হলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, পিথ্বিরাজ রা যিন্দাহ গিরিফ্‌তয়ম ওয়া দাদীয়ম, অর্থাৎ পিথ্বিরাজকে জীবন্ত গ্রেফতার করে দিয়ে দিলাম'। (কাওয়ায়িদুস্ সালিকীন, পৃষ্ঠা ২৪)। উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি সন্ত্রাস করা মুসলমানের কাজ নয়, সন্ত্রাসীকে ভাল করা মুসলমানের কাজ। যেমনিভাবে গরীবে নেওয়াজ এর কাছে এসেছে হত্যা করতে, বিনিময়ে নসীব হয়ে গেল ঈমান।

আসুন, আমরা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে প্রতিরোধ করি এবং কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আউলিয়ায়ে কিরামের শিক্ষার আলোকে আমরা মানবতার চেতনায় সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করে যাই। সন্ত্রাস নয়, ইসলামের মানবতাবাদী স্লোগানকে উজ্জীবিত করি। আল্লাহ আমাদের সকল শুভ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন।

সূফী উদ্ধৃতি

■ তাওয়াক্কুল কখনও উপার্জনের বিরোধী নহে; বরং উপার্জন এবং তাওয়াক্কুল উভয়ই এবাদতের মধ্যে গণ্য।

■ কেহ যদি এই উদ্দেশ্যে আবশ্যকের অতিরিক্ত উপার্জন করে যে, পীড়িত ও অকর্মন্য হইয়া পড়িলে তদবস্থায় সেই অতিরিক্ত উপার্জন ব্যয় করিবে, কিংবা মরিয়া গেলে তাদ্বারা দাফন-কাফনের ব্যয় নির্বাহ হইবে, তবে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই।

■ দুনিয়ার লোকে যাহার খুবই বেশি কদর ও সম্মান করে, তাহার কর্তব্য নিজেকে নিজে খুব অপদার্থ ও তুচ্ছ মনে করা। যাহার ফলে আত্মগরিমা হইতে নিরাপদ থাকিতে পারে।

– হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারকের (র.)

ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (দ.)

• মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার •

আল্লাহ্ পাক তাঁর মনোনীত দীন 'ইসলাম'-এর পরিপূর্ণতায় তাঁর হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী ও রাসূল মনোনীত করে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন। তিনি জগতবাসীর অনুপম ও শাশ্বত আদর্শ এবং আলোর দিশারী। হযরত ঈসা রূহুল্লাহ্ আলাইহিস্ সালামকে আসমানে তুলে নেয়ার পর প্রায় পাঁচশ বছর পৃথিবীতে কোন নবী-রাসূল প্রেরিত হননি। এ দীর্ঘকাল আরবসহ সারা পৃথিবীতে ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতন ঘটে। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোর অনুসারী জাতি-গোষ্ঠীগুলো তাউহীদের শিক্ষা ও আদর্শ থেকে দূরে সরে যায়। রোম, পারস্য, মিসর, গ্রীস ও পূর্ব দেশগুলোর অধিবাসীরা আল্লাহ্র পরিবর্তে সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, কল্পিত দেবদেবীর পূজা শুরু করে। কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয় মানব সভ্যতা, পৃথিবীবাসীর এমন এক দুঃসময়ে শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তির দিশারী হয়ে হযরত মুহাম্মদ (দ.) আবির্ভূত হন। তিনি মযলূমের সাহায্য ও যালিমের বিরুদ্ধে ভূমিকা রেখে প্রাথমিক পর্যায়ে আরবে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তির বিধান 'কুরআন মাজীদ' উপহার দিয়ে কৃতজ্ঞ করেন। মদীনায় কুরআন ও সুন্নাহ্র আদর্শে পরিচালিত ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এতে বিশ্বজনীন শান্তির ভিত্তি স্থাপিত হয়। কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ - سُوْرَةُ الْأَنْبِيَاءِ ٢١

'হে হাবীব, আপনাকে সমগ্র বিশ্বের রহমত করেই প্রেরণ করেছি'।[১]

তিনি মদীনার যমীনে ইসলামী হুকূমত ক্বায়িম করে সর্বকালের সর্বযুগের বিশ্বজনীন আদর্শ রাষ্ট্রনায়কে উপনীত হন। তিনি শান্তি ও কল্যাণের খোদায়ী পয়গাম নিয়ে যখন আবির্ভূত হন, তখন আরব তথা বিশ্বের নৈরাশ্যকর পরিস্থিতিতে একজন ত্রাণকর্তার তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। এ সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, Never in the history of the world was need so great, the time so ripe, for the appearance of a Deliverer. 'এর পূর্বে বিশ্বের ইতিহাসে কখনো একজন মহান ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের সময় ও প্রয়োজন এত বেশি অনুভূত হয়নি।'[২]

তিনি ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপনে অনন্য অবদান রাখেন। এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকায় রয়েছে, Of all the religious personalities of the world Muhammad (sm) was the most successful. 'পৃথিবীর ধর্ম প্রবর্তকদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশী সফলতা অর্জন করেন।'[৩]

জাতি গঠনে বিশ্বনবীর বিপ্লবকে অভূতপূর্ব সৌভাগ্য উল্লেখ করে মনীষী বসওয়ার্থ স্মিথ বলেন, By a fortune absolutely unique in history, Muhammad is a threefold founder of a nation, of an empire and of a religion. 'ইতিহাসের সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব সৌভাগ্য যে, মুহাম্মদ (দ.) একাধারে তিনটির স্থপতি। একটি জাতি, একটি সাম্রাজ্য এবং একটি ধর্ম।'[৪]

মদীনা কেন্দ্রিক ইসলামী রাষ্ট্রে মুহাজির ও আনসার ছাড়াও ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বসবাস করত। কলহে লিপ্ত আরবের বহু সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) মদীনায় কমনওয়েলথ, সম্প্রীতি, সদ্ভাব, ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার নিরিখে এক ঐতিহাসিক ইশ্তিহার ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এ ইশ্তিহার 'মদীনা সনদ' নামে খ্যাত। এ সনদ আরবে বসবাসরত জাতি ধর্ম বর্ণ দল মত নির্বিশেষে সকলের নিকট সমভাবে সমাদৃত হয়। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম মূর বলেন, It reveals the man (the prophet) in his real greatness a master mind not only of his own age, but of all ages. 'মদীনার সনদ শুধু সে যুগের নয় বরং তা সর্বযুগে হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর বিরাট মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে।'[৫] হিট্টি বলেন, This was the first attempt in the history of Arabia at organizing the society with religion rather than blood as its basis. 'আরবের ইতিহাসে রক্তের পরিবর্তে ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা এই প্রথম।'[৬]

৬২৮ খ্রিস্টাব্দের ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি দৃশ্যত মুসলমানদের বিপক্ষে মনে হলেও এর সুদূর প্রসারী প্রভাবে মুসলমান ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অন্তত দশ বছরের

জন্য নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-শৃঙ্খলা স্থিতিশীল থাকে। এর পারিপার্শ্বিক সুফল অনন্তকাল বিরাজ করবে। আল্লাহ পাক একে 'সুস্পষ্ট বিজয়' অভিহিত করে কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا - سُورَةُ الْفَتْحِ ۔ 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি।'[৭]

দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ইসলাম যখন সুসংহত ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রতিষ্ঠা পায় এবং মুসলমানদের সৎ সাহস, উদ্দীপনা ও আত্মপ্রত্যয় সঞ্চারের মাধ্যমে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে বদর যুদ্ধে বৈরী শক্তি পরাজিত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (দ.) আদেশ করলেন, বন্দীদের প্রতি ভাল ব্যবহার কর। তাঁর আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হল। রাসূল পাক (দ.) প্রতিপক্ষের প্রতি যে উদারতা দেখালেন তা বিশ্বের ইতিহাসে বিস্ময়কর ও অনুসরণীয়। কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - سُورَةُ الْبَقَرَةِ ١٩٠

'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না।'[৮]

শান্তির সকল প্রয়াসের আশানুরূপ প্রতিফলন না হওয়ায় মক্কা অভিমুখে অভিযান করতে হয়। প্রায় বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে শান্তিপূর্ণভাবে মক্কা বিজয় শেষে হযরত রাসূল পাক (দ.) চির বৈরীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন নি বরং সকলের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

মহানবীর ক্ষমা ও মহানুভবতায় কবি গোলাম মোস্তফা বলেন, 'কা'বা বিজয় কোন বিশেষ একটি দেশ বিজয় নয়; এটি একটি আদর্শের বিজয়।'[৯]

ঐতিহাসিক মুর বলেন, The magnanimity with which Muhammad treated a people which had so long hated and rejected him is worthy of admiration. 'যে সকল মানুষ এতকাল মুহাম্মদ (দ.)-কে ঘৃণা ও বর্জন করেছে তাদের প্রতি তাঁর উদারতা সত্যিই প্রশংসনীয়।'[১০]

ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী বলেন, But in the hour of triumph every evil suffered was forgotten, every injury inflicted was forgiven, and general amnesty was extended to the population of Mecca. No house was robbed, no woman was insulted. Most truly it has been said that through all the annals of conquest there has been no triumphant entry like unto this one. 'বিজয়ের মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) সমুদয় দুর্ভোগ ভুলে গেলেন, সমস্ত আঘাত যা পেয়েছিলেন ক্ষমা করে দিলেন এবং সমগ্র মক্কাবাসীর জন্য সাধারণ ক্ষমা মনযূর করলেন। কোন গৃহ লুণ্ঠিত হল না, কোন নারী লাঞ্ছিত হল না। সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠার সাথে বলা হয়েছে, বিজয় অভিযানের ইতিহাসে এ ধরনের সফলকাম প্রবেশ আর দেখা যায়নি।'[১১] তিনি সংবিধানে সংযোজন করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত অমুসলিমরা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হবে না তদবধি তাদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে। তিনি উপার্জনক্ষম দারিদ্র্যের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন। তিনি আল্লাহ্‌র বিধান তথা ইসলামের শাশ্বত আদর্শ-দর্শন সমগ্র বিশ্বে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের দূত মারফত পত্র প্রেরণ করেন। প্রেরিত পত্রে তিনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের ঐতিহাসিক গুরুত্বের বর্ণনা দেন।

বাহ্‌রাইন সম্রাট আল্ মুনযির,[১২] ইয়ামামাহ্ শাসনকর্তা হাউযা ইবন আলী,[১৩] উমান শাসনকর্তা জায়ফার,[১৪] রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস,[১৫] পারস্য সম্রাট কিসরা পারভেজ ইবন হুরমুয ইবন নওশীরওয়ান,[১৬] কিবতী সম্রাট মুক্বাওক্বিস ইবন ইয়ামিন,[১৭] প্রমুখসহ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র হুকুমত প্রতিষ্ঠায় বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট পত্র প্রেরণ করে ইসলামের আদর্শ বিকশিত করেন। পারস্য সম্রাট কিস্‌রা পারভেজ ইবন হুরমুয ইবন নওশীরওয়ানকে প্রেরিত পত্রে ছিল: 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। সালাম তার প্রতি, যে হিদায়াতের অনুসারী এবং আল্লাহ্ ছাড়া মা'বূদ নেই, এমন সাক্ষ্য দেয় তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। আমি সকল জীবন্ত সত্তাকে সতর্ককারী, যেন অবিশ্বাসীদের উপর আল্লাহর দলীল ক্বায়িম হয়ে যায়। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করুন। যদি অগ্রাহ্য করেন, তবে দায়ী থাকবেন। -মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্।' হুযূর পাক (দ.)-এর সাহাবা সাহমী (রা.) বাহরাইনের গভর্নরের মাধ্যমে কিস্‌রার নিকট পত্রটি পাঠান, পত্র পেয়ে পারস্য সম্রাট কিস্‌রা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেন এবং পত্রটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন।

নবী করীম (দ.) এ সংবাদ অবগত হন। কিছু দিন পর কিস্‌রা নিহত হলে তার রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-এর পত্র প্রাপ্তদের মধ্যে পারস্য সম্রাট কিস্‌রা ছাড়া কম বেশী সকলে ইসলাম গ্রহণ করুক না করুক; পত্রগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এর মর্মার্থ প্রকাশ করেছেন।

আসলে রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন (দ.) সংবেদনশীল মনের অধিকারী ছিলেন। ঐক্য গঠনে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা 'হিলফুল ফুযূল' তথা শান্তি কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাক-ইসলামী যুগে আরববাসীর মধ্যে গোত্রপ্রীতি এত প্রবল ছিল যে, জাতীয় ঐক্যবোধের কোন ধ্যান-ধারণাই তাদের ছিল না। সে ক্রান্তিকালে সকলের নিকট 'আল আমীন' খ্যাত বালক মহানবী (দ.)-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা পায় জাতীয় ঐক্য, অনুভূত হয় ভ্রাতৃত্ববোধ এবং জোরদার হয় সম্প্রীতি-সংহতি। অথচ আল্লাহ পাকের তরফে এ ঐক্য ও সংহতির নির্দেশনা আসে নুবুওয়াত প্রাপ্তির পর। ইরশাদ হয়েছে,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا - سورة آل عمران ١٠٣

'তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।'[১৮] ঐক্য ও মৈত্রী যে সর্বাবস্থায় প্রশংসনীয় ও কাম্য, তাতে পৃথিবীর জাতি ধর্ম বর্ণ দেশ কাল নির্বিশেষে সব মানুষই একমত।

বিশ্বনবী (দ.) এ ভাবধারায় জাতীয় ঐক্য গঠনের যে সৌধ রচনা করে নযীর স্থাপন করেন, তা বিশ্বে বিরল। মনীষী বার্নার্ডশ বলেছেন, If all the world was united under one leader, then Muhammad (sm) would have the best fitted man to lead the peoples of various creeds, dogmas and ideas to peace and happiness. 'যদি গোটা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদসম্পন্ন মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক নায়কের শাসনাধীনে আনা হত, তবে মুহাম্মদ (দ.)-ই সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতৃত্বরূপে তাদেরকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন।'[১৯]

রাসূলুল্লাহ্ (দ.) ইসলামী ভাবধারায় যে ঐতিহাসিক জাতীয় ঐক্যে বিপ্লব আনয়ন করেন, তা চিরস্মরণীয় চিরন্তন ও শাশ্বত। এ সম্পর্কে গীবন বলেন, It was one of the most memorable revolution which have impressed a new and lasting charter on the nations of the globe. 'এ বিপ্লব এমন এক অবিস্মরণীয় ঘটনা, যা পৃথিবীর সকল জাতির উপর একটি নতুন এবং চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে। ইসলামের মহান সংহতি স্থাপনে এবং সর্বজাতির সমন্বয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন।'[২০]

সমকালীন বিশ্বে শিল্প বিপ্লবের পর জ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আইনের শাসন, মানবাধিকার, উদারতা, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতন্ত্র, সংহতি ও ঐক্য গঠনে প্রগতিবাদীদের বর্তমান দাবীগুলোর পাশাপাশি বিশ্বনবী (দ.)-এর অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্যের দর্শন উপস্থাপন করা হলে তিনিই হবেন সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্যের অতুলনীয় স্থপতি।

সূত্র:

১. কুরআন মাজীদ, সূরাহ্ আম্বিয়া-১০৭।
২. Sayed Ameer Ali, The spirit of Islam, India 1891.
৩. Encyclopedia Britannica, London, William Benton published 1968.
৪.R. Bosworth Smith, Muhammed and Muhammedanism. P. 343
৫. William Muir; The Life of Muhammad.
৬. P. K. Hitti, History of the Arabs.
৭. কুরআন মাজীদ, সূরাহ্ ফাত্‌হ্ -১।
৮. কুরআন মাজীদ, সূরাহ্ বাক্বারাহ্ -১৯০।
৯. গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী।
১০. William Muir, The Life of Muhammad.
১১. Sayed Ameer Ali, The spirit of Islam, 1967. P. 96
১২. ক. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ্, মাজমু'আতুল ওয়াসায়িক্বিস্ সিয়াসিয়াহ্, পৃ. ১৪৫; খ. ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, খণ্ড ৩, পৃ. ৬০০।
১৩. ইবনু সায়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আস্‌র, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৭৯।
১৪. ইবনুল কায়্যিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৫।
১৫. ইমাম বুখারী, সহীহ আল বুখারী, খণ্ড ১, পৃ. ৪-৫।
১৬. আবূ নু'আইম আল্ ইস্‌ফাহানী, দালায়িলুন নুবুওয়্যাহ্, খণ্ড ১, পৃ. ৩৪৮।
১৭. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।
১৮. কুরআন মাজীদ, সূরাহ্ আলে ইমরান, ১০৩।
১৯. George Bernard Shaw, Getling Married.
২০. Giban, History of Islam.

তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরীফ এবং বেলায়তে মোতলাকার উৎস সন্ধানে

• জাবেদ বিন আলম •

পূর্ব প্রকাশের পর:

মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ইসরাইলী জনগোষ্ঠীর সংশোধন এবং মানসিক বক্রতা পরিবর্তনের লক্ষ্যে হযরত মুসা (আ.) এবং হযরত হারুন (আ.) এর পর হযরত ইউসা বিন নুন (আ.), হযরত হিযকীল (আ.), হযরত ইলিয়াস (আ.), হযরত আল ইয়াসা (আ.), হযরত হানযালা (আ.), হযরত শামবীল (আ.)সহ অনেক নবী প্রেরণ করেন। হযরত ইউসা বিন নুন (আ.) এর সময়ে হযরত ইউসুফ (আ.) এর পবিত্র সিন্দুক, হযরত মুসা (আ.) এর অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন লাঠি এবং হযরত হারুন (আ.) এর বস্ত্র নিয়ে দুর্ধর্ষ আমলেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলে উপর্যুক্ত বরকতময় তাবারুকের বদৌলতে ইসরাইলীরা কেনান বিজয়ে সক্ষম হন। হযরত খিজির (আ.) এর সঙ্গে সাক্ষাত ও কথোপকথনকালে যে ব্যক্তি হযরত মুসা (আ.) এর সফর সঙ্গী ছিলেন তাফসীরকারকদের মতে তিনি হলেন হযরত ইউসা বিন নুন (আ.)। প্রচন্ড দৈহিক শক্তির অধিকারী আমলেকা জনগোষ্ঠীর উপর হযরত ইউসা বিন নুনের নেতৃত্বে ব্যাপক বিজয় অর্জনের সঙ্গে খিজরী বেলায়তকে অনেকে সম্পর্কযুক্ত বলে বিশ্বাস করেন। কেনান বিজয় এবং আমলেকাদের পরাজিত করার পর হযরত ইউসা বিন নুন (আ.) ইসরাইলীদেরকে পবিত্র বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য যে 'নতশিরে (সিজদারত অবস্থায়) তাওবা বলে' অতীতের পাপকর্ম সমূহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে পবিত্র গৃহ বায়তুল মুকাদ্দাসে ইসরাইলীদেরকে প্রবেশের জন্য মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছিল। কিন্তু অকৃতজ্ঞতার অক্টোপাশে আবদ্ধ মানুষ আল্লাহর নির্দেশের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে উপহাস করতে থাকে। এ ধরণের অকৃতজ্ঞ জনগোষ্ঠীর প্রতি মহান আল্লাহ শাস্তি স্বরূপ প্লেগ মহামারীর মাধ্যমে সত্তর হাজার বনী ইসরাইলীকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেন। কেনান অবস্থানকালে ইসরাইলীদের মধ্যে পুনর্বার মূর্তিপূজা অনুপ্রবেশ করে। এটি ছিল শিরক এবং নিঃসন্দেহে সীমালঙ্ঘন। ইসরাইলীদেরকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগের মানসে হযরত ইলইয়াস (আ.) আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু কুরবানী দেন, যা মহান আল্লাহ কুদরতি ঝলকে কবুল করেন। এ দৃশ্য অবলোকনের পর বহু ইসরাইলী মূর্তি পূজা ত্যাগ করে পুনরায় তাওহীদে শামিল হয় এবং হযরত ইলইয়াস (আ.)কে প্রেরিত নবী স্বীকার করে আল্লাহর দরবারে সিজদারত হয়। এ ধরনের মুযিযা প্রদর্শনের পরও ইসরাইলীদের মধ্যে সত্য ধারনে অসম্মতি বিরাজ করায় 'কায়ণ্ড উপত্যাকায়' আল্লাহর গজবে সব মূর্তি পূজারী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

হযরত ইউসা বিন নুনের সময় হযরত ইউসুফ (আ.) এর বরকতময় সিন্দুকের বদৌলতে আমলেকাদের পরাজিত করে কেনান বিজয় হলেও ইসরাইলীদের স্বভাবজাত অকৃতজ্ঞতা, নবুয়ত, রিসালতের অস্বীকৃতি এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যহীনতার কারণে ইসরাইলীরা পুনঃ পুনঃ অভিশাপের মোড়কে দলিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে দীর্ঘায়ু লাভ করার ফলে ইসরাইলী মূর্তি পূজকরা মৃত্যু ভীতি ভুলে যায়। উল্লেখ্য যে, স্বভাবজাত সন্দেহ প্রবণতা এবং নবুয়ত ও সুশাসনের প্রতি অবজ্ঞার কারণে হযরত ইউসা বিন নুন (আ.) এবং সুশাসক কালেব বিন ইউকান্না'র পর ইসরাইলীরা নবুয়তের বরকতময় সান্নিধ্য এবং সুশাসনের অভিজাত্য থেকে বঞ্চিত হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ইসরাইলীদের তৎকালীন বাদশাহ নির্বোধ তায়ফুর ঘোষণা দেন, 'মানুষ মরণশীল নয়'। কিন্তু সর্বশক্তিমান অনন্ত অসীম আল্লাহ ইসরাইলীদের এ ধরণের ভ্রান্ত বিশ্বাস মুহূর্তেই অমূলক প্রমাণ করে অজ্ঞ বাদশাহ তায়ফুর সমেত তার সকল অনুগামীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের নির্দেশনামা কার্যকর করেন। এ সবই হযরত হানযালা (আ.) এর সমকালীন ঘটনা। হযরত হানযালা (আ.) এর পর ইসরাইলীদের হিদায়তের পথ নির্দেশনার লক্ষ্যে কোন নবী আগমন করেননি। দিন রাত অন্যায় অপকর্ম এবং পাপাচারে লিপ্ত থেকে ভোগ উপভোগের উৎফুল্লতায় এরা হযরত মুসা (আ.) এবং পরবর্তী নবী রসূলদের সতর্কবাণীসমূহ সম্পূর্ণ ভুলে যায়। এভাবে কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে যায়। ইতোমধ্যে দুর্ধর্ষ আমলেকা সম্প্রদায় হারানো আবাসভূমি কেনান দখলে নেয়ার জন্য গোপনে ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ইসরাইলীরা কেনান বিজয়ের প্রেক্ষাপট ভুলে গিয়ে নিজেদের কষ্টকর যাতনা বহুল অতীত সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে ওঠে। পাপাচারের শাস্তি স্বরূপ "নবুয়তের সান্নিধ্য এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ইহজাগতিক

সম্মান" উভয় দিক আল্লাহ পাক ইসরাইলীদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেন। মহান আল্লাহ ইসরাইলীদের কর্মফলের শাস্তিস্বরূপ এ জনগোষ্ঠীর প্রতি লাঞ্ছনা, অপদস্থতা ও অবজ্ঞাকে নিত্য সঙ্গী হিসেবে জারী করেন। ইসরাইলীদের এ ধরনের দুসময়ে দুর্ধর্ষ আমলেকা সম্প্রদায়ের প্রবল আক্রমণের মুখে আল্লাহ প্রদত্ত মহা বরকতময় "তাবুতে সাকীনা" (পূণ্যময় সিন্দুক) হস্তচ্যুত হয় এবং আমলেকাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। "তাবুতে সাকীনা" আমলেকাদের দখলে আসার পর ইসরাইলীরা সৌভাগ্যের পরশমনি হারিয়ে পৃথিবীর সর্ব নিকৃষ্ট, নিঃসম্বল নিঃস্ব জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এ ধরনের অবস্থায় আমলেকাদের প্রতিশোধ প্রবণতার মুখে ইসরাইলীরা অনেকাংশে পারস্পরিক বন্ধন ও সম্পর্ক হারিয়ে ছিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এ সময় ইসরাইলীদের মধ্যে কেন্দ্রিয় শাসকের অনুপস্থিতির পাশাপাশি গোত্র সমূহের সম্মিলিতভাবে মনোনীত কোন শাসকও তখন ছিলনা। ইসরাইলী জনগোষ্ঠীকে পরিচালনার জন্য কেন্দ্রিয় নির্বাহী কর্তৃত্বের অনুপস্থিতির সুযোগে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসরাইলীদের উপর প্রায়ই আক্রমণ পরিচালনা করত। পূণ্যভূমি কেনান থেকে বিতাড়িত অতুলনীয় বিক্রমশালী, দুর্ধর্ষ এবং বিকট দেহাবয়বের আমলেকারা এ সুযোগে কেনান পুন দখলে সক্ষম হয়। 'তাবুতে সকীনা' হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় দুর্দশায় নিপতিত ইসরাইলীরা আমলেকাদের অত্যাচারে ঘরবাড়ী থেকে উৎখাত হয়। নিজেদের সন্তান সন্ততি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় শোকাবহ পরিবেশে ইসরাইলীরা দুঃসময়ের কালো রাত্রি অতিক্রম করতে থাকে। প্রায় সাতশত বছরের দুঃসময় অতিবাহিত হবার পর নিঃস্ব ইসরাইলীদের অবিরত কান্না এবং ফরিয়াদের ফয়সালা হিসেবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত শামবীলকে (আ.) নবী মনোনীত করে ইসরাইলীদের হিদায়তের নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রেরণ করেন। নবুয়তের দায়িত্ব গ্রহণ করে হযরত শামবীল (আ.) হযরত মুসা (আ.) এর নির্দেশিত জীবন বিধান ধারন করতে ইসরাইলীদের আহ্বান জানান। ফিরাউনের সময়কালে নির্যাতিত দাস শ্রেণিভুক্ত হওয়ায় নিগৃহীত বনি ইসরাইলরা হযরত মুসা (আ.) এর নবুয়তের তাৎপর্যপূর্ণ গণবিদ্রোহের কারণে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নিজেদের সংশয়বাদীতা এবং মানসিক বৈকল্যের কারণে ইসরাইলীরা বার বার আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির মুখোমুখি হয়। সর্বশেষ আমলেকা সম্প্রদায়ের দানবীয় কর্তৃত্বে নিগ্রহের মুখে সর্বস্ব হারিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে অপদস্থ জাতিতে পরিণত হয়।

ইসরাইলীদের শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করে এবং ইসরাইলীদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে হযরত শামবীল (আ.) তাদের জন্য একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক নিযুক্তির আবেদন আল্লাহর দরবারে পেশ করেন। প্রিয় নবীর ফরিয়াদ আল্লাহ পাক কবুল করেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত শামবীলকে (আ.) ইসরাইলীদের বাদশাহ হিসেবে তালুতের নাম ঘোষণার বাণী প্রেরণ করা হয়। মহান আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী তালুতকে ইসরাইলীদের শাসক নির্বাচন করা হয় এবং তালুতের নেতৃত্বে আমলেকাদের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানানো হয়। তালুত গরীব আলেম পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি হযরত ইউসুফ (আ.) এর অনুজ বিন ইয়ামীনের অধস্তন বংশধর। তালুতকে বাদশাহ নির্বাচনের বিষয়ে মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত শামবীলের (আ.) ঘোষণা থাকা সত্বেও ইসরাইলীরা তালুতকে তাদের নেতা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এ জন্য সন্দেহপ্রবণ, খুঁতখুঁতে স্বভাব এবং অন্যের ত্রুটি বিচ্যুতি আবিষ্কার করার বদ অভ্যাসের জাতি ইসরাইলীরা তালুতের দারিদ্রতাকে খুঁত হিসেবে উত্থাপন করে। ইসরাইলীদের অস্বীকৃতি অবহিত হয়ে হযরত শামবীল (আ.) তাদেরকে নিজেদের প্রার্থনা এবং অনুনয় বিনয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং জানিয়ে দেন যে, "কেউ কারো কাছে কোন বস্তু প্রার্থনা করলে সে ক্ষেত্রে দাতার ইচ্ছা পছন্দই কার্যকর থাকে।" হযরত শামবীল (আ.) আরো জানান তালুতের বাদশাহ নিযুক্তি সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর মঙ্গল ও কল্যাণ প্রসূত দান। তালুত ছিলেন মূলতঃ সুপ্রসন্ন, নির্মল বিবেক, পুত পবিত্র চরিত্র এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। এ ব্যাপারে সূরা বাকারার ২৪৭ আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। হযরত শামবীল (আ.) তালুতের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে দুর্ধর্ষ আমলেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবার জন্য ইসরাইলীদেরকে আহ্বান জানান। যে বরকতময় সিন্দুক হস্তচ্যুত হবার কারণে ইসরাইলীরা প্রভাব প্রতিপত্তি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, মূর্তিপূজক আমলেকারা তা বেশী সময় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। কারণ পবিত্র সিন্দুকটি আমলেকারা তাদের দেবালয়ে দেব মূর্তির পাশে রেখেছিল। এতে দেখা যায় প্রতিদিন প্রত্যুষে দেবমূর্তি সিন্দুকের প্রতি অধোমুখি হয়ে পড়ে থাকছে। দেব মন্দিরে দেবতার দুর্দশা দেখে আমলেকারা বিচলিত হয়ে পড়ে বরকতময় সিন্দুক ইসরাইলীদের নিকট থেকে ছিনিয়ে আনার পর আমলেকা শাসক জালুতের কেনান জুড়ে ইঁদুরের

অপ্রতিরোধ্য উৎপাত দেখা দেয়। ইঁদুরের উৎপাতে মাঠের ফসল তছনছ হয়ে পড়ে। মরা ইঁদুরের বিষাক্ত গন্ধে কেনান জুড়ে মহামারী হিসেবে দেখা দেয় প্লেগ। রাজ্যের এহেন দুর্গতি লক্ষ্য করে আমলেকা শাসক জালেম জালুত পবিত্র সিন্দুকটি দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। আল্লাহর মেহেরবাণীতে সিন্দুকটি ফেরেশতাদের সাহায্যে ইসরাইলী জনবসতি এলাকায় চলে আসে। বরকতময় সিন্দুক ইসরাইলীদের নিয়ন্ত্রণে আসার পর বাদশাহ রূপে তালুতের নিযুক্তি নির্বিঘ্ন হয়। সকল ইসরাইলী তালুতের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে জালেম জালুতের বিরুদ্ধে অত্যুৎসাহে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে থাকে। তবে তালুত ইসরাইলীদের অতীত ইতিহাসের ঘটনাবলী স্মরণ করে চিন্তাগ্রস্ত হন। কারণ ইসরাইলীদের জাতিগত স্বভাব হচ্ছে শুরুতে রাজি হয়ে পরে পিঠটান দেয়া। স্বভাবগতভাবে তারা সন্দেহ প্রবণ। এ কারণে ইসরাইলীদের উৎসাহ এবং সাহসিকতা পরীক্ষার জন্য আল্লাহ পাক হযরত শামবীলকে (আ.) অবহিত করেন। ফিলিস্তিন যাবার পথে নদী থেকে পানি পান করার মাধ্যমে এ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। সূরা বাকারার ২৪৯ আয়াতে এ বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় যাঁরা পানি পান করেননি কিংবা অত্যল্প পান করেছেন তাঁরা কম সংখ্যক ইসরাইলী এবং এরাই প্রচন্ড সাহসিকতার সঙ্গে জালেম জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। বিশাল সংখ্যক ইসরাইলী অতিরিক্ত পানি পান করেও তৃষ্ণা নিবারণে ব্যর্থ হয়েছে এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সাহস ও যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। তাফসীরকারকগণ জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা ৩১৩ জন বলে উল্লেখ করেছেন। আমলেকা নেতা দুর্ধর্ষ জালুতের লক্ষাধিক সৈন্যের বিরুদ্ধে বাদশাহ তালুত মাত্র ৩১৩ জন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের মুখোমুখি হন। জালেম জালুতের দৈত্যসম দৈত্যাকৃতির ভয়ঙ্কর চেহারা, বিশাল বপু এবং অসীম সাহসিকতার বিষয়ে ইসরাইলীরা পূর্ব থেকে অবহিত ছিল। এ কারণে জালুতের মুখোমুখি হতে অনেকে শঙ্কিত ছিলেন। ৩১৩ জন সৈন্যের মধ্যে কেউ জালুতকে আক্রমণের সাহস পাচ্ছিলেন না। এ সময় বাদশাহ তালুত অর্ধেক সাম্রাজ্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা সত্ত্বেও যখন কেউ জালুতকে আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছেন না, তখনি মধ্যম দেহাকৃতির অনাকর্ষণীয় দাউদ জালুতকে আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসেন।

হযরত দাউদ (আ.)-এর আরো ছয় ভাই ছিল। তাঁরা সকলেই সৎ এবং জালিম জালুতের বিরুদ্ধে তালুতের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। হযরত দাউদ (আ.) ছিলেন বয়সে সকলের ছোট। যুদ্ধে অংশ গ্রহণ বিষয়ে তাঁর কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় সবাই জালুতের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ বিষয়ে তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু হযরত দাউদ (আ.) ছিলেন ঐশী শক্তিতে বিশেষভাবে উৎফুল্ল এবং প্রেরণাদীপ্ত। বাদশাহ তালুতের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে হযরত দাউদ (আ.) নিজের পরিচয় দিয়ে যুদ্ধ সম্পর্কে স্পষ্ট করে ঘোষণা দেন, "শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই বটে, তবে হিংস্র পশুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে।" উল্লেখ্য যে, জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমনকালে হযরত শামবীল (আ.) তালুতকে একটি গাত্রবর্ম প্রদান করে বলেছিলেন, "এ বর্ম যাঁর শরীরে ঠিকমত লাগবে তিনিই জালুতকে পরাজিত এবং নিহত করবেন।" বাদশাহ তালুত বর্মটি অনেককে পরিধান করানোর পর যথারীতি ঠিক মত না লাগায় সবশেষে উঠতি বয়সের যুবক হযরত দাউদকে (আ.) পরিধান করান। দেখা গেল গাত্র বর্মটি হযরত দাউদ (আ.) এর শরীরে যথাযথভাবে লেগেছে। হযরত শামবীল (আ.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাই জালুতকে আক্রমণের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন হযরত দাউদ (আ.)। গায়েবী আওয়াজ সমৃদ্ধ তিনটি পাথর স্বীয় থলেতে উঠিয়ে নিয়ে যুদ্ধে এগিয়ে যান। হযরত দাউদ (আ.) সম্মুখ যুদ্ধে জালুতের মুখোমুখি হলে জালিম জালুত নানা ভাবে হযরত দাউদকে (আ.) নিরুৎসাহিত করতে থাকে। প্রতিপক্ষ অল্পবয়সী যুবকের নিকট কোন যুদ্ধাস্ত্র না থাকায় বলদর্পী জালুত পরিহাসচ্ছলে অনেক বাক্য বিনিময় করে হযরত দাউদ (আ.)কে যুদ্ধ পরিত্যাগের আহ্বান জানায়। জবাবে হযরত দাউদ (আ.) বলেন, "কুকুরকে পরাজিত করতে যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োজন হয়না। জালুত তো কুকুরের চেয়ে অধম। কুকুরকে পাথর মেরেই হত্যা করতে হয়। জালুত বার বার হযরত দাউদকে (আ.) যুদ্ধ পরিত্যাগের আহ্বান জানায়। জবাবে হযরত দাউদ (আ.) ঘোষণা দেন, "হে অভিশপ্ত, আমি মহান আল্লাহর হুকুমে জালিম দুঃশাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছি। পাথর নিক্ষেপ করেই তোমাকে হত্যা করা হবে। মহান আল্লাহ আমাকে সে শক্তি প্রদান করেছেন।" সঙ্গে সঙ্গে হযরত দাউদ (আ.) দুর্ধর্ষ আমলেকা শাসক জালুতের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করেন। প্রথম প্রস্তরের আঘাতেই জালুতের মস্তক বিদীর্ণ হয়ে যায়। জালুত ধরা পৃষ্ঠে লুটিয়ে পড়ে। জালুতের পরাজয় এবং নিহত হবার ঘটনা অবলোকন করে আমলেকা বাহিনী দ্রুত ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। লক্ষাধিক সৈন্যকে

তালুত বাহিনী পশ্চাদ্ধাবন করে হতাহত করে। মহান আল্লাহ অদৃশ্য শক্তির মাধ্যমে মাত্র ৩১৩ জন্য সৈন্যকে অসম যুদ্ধে সমকালীন অবস্থার আলোকে অনেক বেশি আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত লক্ষাধিক সৈন্যের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ২৫০ এবং ২৫১ আয়াতে উল্লেখ আছে, "জালুত ও তার বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হবার পর বিশ্বাসীরা প্রার্থনা করল, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য দাও, আমাদের পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করো এবং সত্য অস্বীকারকারীদের ওপর আমাদের বিজয়ী করো। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা সত্য অস্বীকারকারীদের পরাজিত করল। দাউদ জালুতকে নিধন করল। আল্লাহ তাকে রাজত্ব এবং হিকমত দান করলেন, দান করলেন বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান। এভাবে আল্লাহ যদি মানুষের একটি দলকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন তা হলে অনাচার পৃথিবীকে পুরোপুরি বিপর্যস্ত করে দিত। কিন্তু আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল।"

তালুত জালুতের লড়াইয়ে দেখা যায় মহান আল্লাহ জালিমদেরকে সংশোধনের জন্য যথেষ্ট সময় দেন। মানুষের উপর জুলুম পরিহারের জন্য বার বার সতর্কবাণী প্রেরণ করেন। এর পরও যদি সীমালংঘন বন্ধ না হয়, তাহলে নির্যাতিতের পক্ষে আল্লাহর গায়েবী সাহায্য অবধারিত হয়ে যায়। মহান আল্লাহ তাঁর নবী রাসূলদের ব্যবহার্য জিনিসপত্রে উত্তম মুজিযা এবং ফজিলত দান করেছেন। কেনান বিজয়ের লক্ষ্যে যুদ্ধে যাবার কালে হযরত ইউসা বিন নুন (ক) হযরত ইউসুফ (আ.) এর পূণ্যময় সিন্দুক, (খ) হযরত মুসা (আ.) এর বরকতময় লাঠি এবং (গ) হযরত হারুন (আ.) ব্যবহৃত কাপড় সঙ্গে নেন। এ সকল বস্তু ছিল অত্যন্ত বরকতময় এবং মহান আল্লাহর অফুরন্ত রহমতের ধারায় সিক্ত। এ সকল বরকতময় বস্তুর বদৌলতে আমলেকা জনগোষ্ঠীর হিংস্র দানবীয় আক্রমণ প্রতিহত করে ইসরাইলীরা বিজয় অর্জন করে। তাওহীদের অনন্য প্রাণকেন্দ্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ এ ধরনের বরকতময় তাবারুকের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান। ইসরাইলী জনগোষ্ঠীর প্রতি মহান আল্লাহর কঠিন শাস্তি বিধান এবং বিভিন্ন সময় নিগৃহীত হবার প্রেক্ষাপট থেকে মানবজাতির শিক্ষা গ্রহণের অনেক কিছু রয়েছে। মহান আল্লাহ সংশয়বাদীতা, অংশীদারীতা, অহমিকা, কপটতা, মিথ্যাবাদীতা, দোদুল্যমানতা অপছন্দ করেন। ইসরাইলী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সময়ের কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর সতর্কবাণী থেকে আদম সন্তানদের সতর্ক জীবনাচারের নির্দেশনা রয়েছে।

জালুতের বিরুদ্ধে ৩১৩ জন মুমিন ইসরাইলী সৈন্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। তালুতের নেতৃত্বাধীন এ সেনাবাহিনী ছিল আহলে কিতাবের অনুসারী। এরা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পুত্র হযরত ইসহাক (আ.) এর বংশধারার উম্মত। জন্মভূমি পবিত্র মক্কা থেকে পূণ্যভূমি মদিনায় হিজরতের পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর নেতৃত্বে পৌত্তলিক মুনাফিকদের বিরুদ্ধে তাওহীদবাদীদের ধর্ম ইসলামের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদর প্রান্তরে। ইতিহাসে এটি বদর যুদ্ধ নামে খ্যাত। এ যুদ্ধে সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩। পৌত্তলিকদের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন্য সৈন্যের অনেকেই প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে আক্রমণকারী পৌত্তলিকদের পরাজিত করেন। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক আখেরী নবী, আফজালুল আম্বিয়া, হযরত মুহাম্মদ (দ.) হলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর প্রথম পুত্র হযরত ইসমাঈল জবীহুল্লাহ (আ.) এর অধস্তন বংশধারার একমাত্র নবী। পূর্ববর্তী সকল আম্বিয়া কিরাম তাঁর আগমনের সুসংবাদ মানব জাতিকে অবহিত করেছেন পূর্ববর্তী আম্বিয়া কিরামদের আগমন এবং মানবজাতির প্রতি হিদায়তের নির্দেশনা সম্পর্কিত বিষয়াদি পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহর অনুপম ইচ্ছায় মহানবী (দ.) সত্যায়িত করেছেন।

জালেম পৌত্তলিক জালুতের বিরুদ্ধে তালুতের সৈন্য সংখ্যা ৩১৩। বদর যুদ্ধেও সৈন্য সংখ্যা ৩১৩। উভয় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন পুতপবিত্র। উভয় যুদ্ধে সৈন্য সংখ্যার সামঞ্জস্য আহলে কিতাবীদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা নৈকট্য ঐক্য ও সংহতির বিষয়টি হচ্ছে মহান স্রষ্টা আল্লাহর হিকমত। ঘটনা পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে আল্লাহ তাওহীদবাদীদের ঐক্যের অন্যতম একটি সূত্র স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। হযরত দাউদ (আ.) এর আক্রমণে পৌত্তলিক জালেম শাসক জালুত নিহত হয় এবং ৩১৩ জন্য মুমিন সৈনিক বিজয়ী হন। বদর প্রান্তরেও একই ধরনের বিজয় তাওহীদবাদীদের চির উড্ডীন পতাকাকে ঐশী জলোয়ায় মহিমান্বিত করে রাখে। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ মূলতঃ তাওহীদবাদীদের ঐক্যের পতাকাকে সমুজ্জ্বল রাখার নির্দেশনা দিয়ে আসছে। বিশ্বাসীদের ঐক্যের সূত্রসমূহকে প্রাণবন্ত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থ তাওহীদবাদী মানুষের ঐক্যের পয়গাম সম্বলিত সূত্রসমূহের সংক্ষিপ্ত সার। বেলায়তে মোতলাকা মূলত মানব জাতির ঐক্যের পাদটীকাও বটে।

(চলবে)

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাবার্‌রুক এর গুরুত্ব

• আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ বদরুদ্দোজা •

'তাবার্‌রুক' আরবী শব্দ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন বা বস্তুর স্পর্শধন্য ও স্মৃতি বিজড়িত স্থান বা বস্তুকে বরকত বা কল্যাণকর হিসেবে গ্রহণ করা। অর্থাৎ, আম্বিয়া-এ কিরাম ও আউলিয়া-এ ইযামের পোশাক পরিচ্ছদ, হাতের লাঠি, মাথার পাগড়ী এবং তাঁদের জায়নামায ইত্যাদি বস্তুর প্রতি সম্মান ও ইয্‌যত প্রদর্শন করা। এ ধরনের বস্তু ও স্পর্শধন্য স্মৃতি মুসলমান সমাজে তাবার্‌রুক নামে বিশেষভাবে পরিচিত।

কোন উরস শরীফের খাদ্য-দ্রব্য, আউলিয়া-এ কিরামের রওযা শরীফের সাথে সম্পৃক্ত পানি, আহার্য যে কোন দ্রব্য-বস্তুকে তাবার্‌রুক বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদ, হাদীস শরীফ, তাফসীর গ্রন্থাবলী এবং বুযর্গানে দীনের বাণী থেকে এ বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের পোশাক-পরিচ্ছদ বা তাঁদের স্পর্শধন্য বস্তুতে অনেক বরকত রয়েছে।

সাহাবা-এ কিরাম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবার্‌রুক অতি মুহাব্বাত ও আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতেন এবং দীন ও দুনিয়া উভয় জগতে তাঁদের জন্য তা কল্যাণকর বিশ্বাস করতেন। এ জন্য আহলে হক বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তাবার্‌রুকে বিশ্বাসী। এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাবার্‌রুক সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও অকাট্য কিছু প্রমাণ সহকারে আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

এক. তাবার্‌রুকের অবমাননায় পূর্বের কিছু উম্মত ধ্বংস হয়ে যায়: তাফসীর-ই নঈমী, খাজাইনুল ইরফান ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে যে, সৈয়্যদুনা হযরত আদম (আ.) এর প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাঠের তৈরী একটি সিন্দুক (তাবুত) অবতীর্ণ করেছিলেন। এ সিন্দুক পাইন গাছের কাঠদ্বারা তৈরী, তিন হাত লম্বা ও দু'হাত চওড়া ছিল। এ সিন্দুক বংশ পরম্পরায় স্থানান্তরিত হয়ে হযরত মুসা (আ.) এর নিকট পৌঁছেছিল। এর মধ্যে তিনি তাওরীত শরীফ রাখতেন। মূসা (আ.)-এর ছড়ি, বস্ত্র ও পাদুকা মোবারক ও তাওরীতের ফলকগুলোর ভগ্নাংশসহ। এ সিন্দুক দ্বারা বনী ইস্রাইল প্রশান্তি লাভ করত। তারা যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হত, তখন এ সিন্দুককে সামনে রেখে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করত। ফলে এর বরকতে তারা সমস্যার সমাধান পেয়ে যেত। শত্রুর মোকাবেলায় জয়লাভ করত। আর যখন কোন অভাব দেখা দিত তখন তারা সিন্দুকটিকে সামনে রেখে প্রার্থনা করত, তাঁদের অভাব মোচন হয়ে যেত। কিন্তু যখন বনী ইস্রাঈলের অবস্থার অবনতি ঘটে এবং তাদের অপকর্মের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আমালিকা সম্প্রদায়কে বিজয়ী ও শক্তিশালী করেন। তারা বনী ইস্রাঈলের নিকট থেকে এই সিন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে সেটার প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করতে থাকে। তারা সেটা নিয়ে অপবিত্র ও নাপাক স্থানে রেখেছিল। সিন্দুকের প্রতি অবমাননার ফলে তারা বিভিন্ন ধরনের বিপদ, রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, এমনকি তাদের পাঁচটি বস্তি বা জনপদ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও উজাড় হয়ে যায়। এ কারণে তারা যখন অত্যন্ত হতভম্ব ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, তখন বনী ইস্রাঈলের এক মহিলা তাদের উদ্দেশ্যে বলল, যদি তোমরা নিরাপত্তা ও শান্তি চাও তবে এ সিন্দুকটিকে তোমাদের এখান থেকে বাইরে কোথাও রেখে এস। তোমাদের ধ্বংসের কারণ হল এই সিন্দুকের প্রতি অবমাননা এবং বেয়াদবী। তারাও এটা স্বীকার করল। তারা এটা স্বীকার করল যে, সিন্দুকের প্রতি অবমাননা করা ও বেয়াদবী করার কারণে তাদের অবনতি ও পতন হল তাই তারা গরুর গাড়ীর উপর সিন্দুকটি স্থাপন করে গরুগুলোকে ছেড়ে দিল। ফেরেস্তারা সেটা বনী ইস্রাঈলের সম্মুখে তাদের বাদশা তালুতের নিকট নিয়ে আসে। অতএব তাবার্‌রুকগুলোর কারণে আল্লাহ্‌র হুকুমে তালুতের বিজয় হয় এবং সেই সিন্দুকের আগমন তালুতের কর্তৃত্বের নিদর্শন স্বরূপ হয়েছে। যার সংবাদ আয়াত শরীফে বনী ইস্রাঈলের নবী হযরত শামভীল আলাইহিস্‌সালাম প্রদান করেছেন।

দুই. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্র জামার বরকতে তাঁর আব্বাজান হযরত ইয়াকুব (আ.) এর চক্ষুদ্বয় উপশম হয়ে যায়: কুরআন মাজীদে হযরত ইউসূফ (আ.)-এর পবিত্র জামার বরকতে তাঁর আব্বাজান হযরত সৈয়্যদুনা ইয়াকুব (আ.)-এর চক্ষুদ্বয় উপশম হবার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

اذهبوا بقميصى هذا فالقوه على وجه ابى يأت بصيرا

অর্থাৎ, হযরত ইউসুফ (আ.) বলেন, তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রাখবে। তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন।

فلما ان جاء البشير القه على وجهه فارتد بصيرا

অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা এল, সে জামাটি হযরত ইয়াকুব (আ.) এর মুখমন্ডলে রাখল, সেই মুহূর্তে তাঁর চক্ষুদ্বয় আলোকিত ও আরোগ্য এবং দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্র জামার বরকত। সুতরাং এ কথাই প্রমাণ হলো যে, যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্র পোশাকে এ পরিমাণ বরকত ও শেফা থাকে, তাহলে নবীকুল সরদার হুযূর পুর নূর (দ.)-এর সেই মোবারক পোশাকে কী পরিমাণ বরকত থাকবে তার কোন সীমা পরিসীমা নেই। যেগুলো হুযূর (দ.)-এর পবিত্র শরীরের স্পর্শে ধন্য সেগুলো অতুলনীয়। এ কারণেই সাহাব-এ কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম হুযূর (দ.) এর পোশাক মুবারক এবং যে বস্তুসমূহ হুযূরের নূরানী শরীরের সাথে লেগে ধন্য হয়েছে, সেগুলোকে অত্যন্ত বরকতময়, উপকারী এবং বিপদ ও রোগ বিমোচক মনে করতেন। সেগুলোর অত্যন্ত ইয্যত ও সম্মান করতেন এবং কোনো তাবারুরুক নিজের কাছে থাকা দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ অপেক্ষা উত্তম মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে এতবেশী সংখ্যক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, সে গুলোর সবকটি এখানে উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। তবুও এ প্রসঙ্গে ক'টি হাদীস উল্লেখ করছি।

ক. উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব বিন্‌তে আবু সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম হুযূর (দ.)-এর খিদমতে হাযির হলেন, তখন তিনি গোসল করতে ছিলেন, হুযূর (দ.) তাঁর মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দিলেন, বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর চেহারা এমন রূপপূর্ণ ও সুদর্শন হয়ে যায় যে, বার্ধক্যেও তার চেহারা থেকে যৌবনের রূপ ও দীপ্তি বিদূরীত হয়নি। (যিকর-ই জামীল)

হাত মোবারকের প্রভাব পৌঁছানোর জন্য পানি ছিল একটি মাধ্যম মাত্র। কারণ পানি হয়ত মুছে ফেলা হয়েছিল অথবা শুকিয়ে গিয়েছিল কিন্তু তা চলে যাওয়াতেও হাত মোবারকের প্রভাব চলে যায়নি, বরং বছরের পর বছর তার মুখমন্ডলে স্থায়ী থাকে। বার্ধক্যের প্রভাব চেহারাতে প্রকাশ হওয়া প্রাকৃতিক বিষয়। রস শুকিয়ে যাওয়ার ফলে বৃদ্ধ বয়সে যে ধরনের আকৃতি হয়, তা বর্ণনার প্রয়োজন নেই। চক্ষুদ্বয় ভিতরে ঢুকে পড়ে, গন্ডদেশের হাড়গুলো প্রকাশিত হয়, চর্ম ঢিলা হয়ে ভাঁজ পড়ে যায়। যত সুন্দর মানুষই হোক বার্ধক্যের প্রভাব প্রকাশের পর সৌন্দর্য ও যৌবন স্থিত থাকে না। কিন্তু হাত মোবারকের কিরূপ প্রভাব ছিল যে, এই স্বাভাবিক পরিবর্তনাদি প্রতিরোধ করে যৌবনের আভা স্থির ছিল। যদিও ডাক্তার ও হেকীম অনেক ঔষধ আবিস্কার করেছেন যাতে বৃদ্ধাবস্থায় চেহারার আকৃতি পরিবর্তন না হয় এবং চেহারা সৌন্দর্যপূর্ণ থাকে। কিন্তু এগুলো দ্বারা যৌবনের দীপ্তি অপরিবর্তিত রাখা সম্ভব নয়। এ ছিল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের হাত মোবারকের বিশেষত্ব ও বারাকাত, যা দ্বারা বৃদ্ধ বয়সেও যৌবনের দীপ্তি অপরিবর্তিত থাকে।

খ. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক্ব (রাদ্বি.)-এর কাছে হুযূর (দ.)-এর একটি জুব্বা শরীফ ছিল। তিনি বলেন, ঐ জুব্বাটি হুযূর (দ.) পরিধান করতেন। আমরা তা ধুয়ে রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে রোগীদের পান করাতাম এতে তারা আরোগ্য হয়ে যেত।

গ. ইমাম ইবন মামূন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমাদের কাছে হুযূর পুর নূরের পেয়ালাসমূহ থেকে একটি পেয়ালা ছিল। আমরা এতে পানি ঢেলে রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে রোগীদের পান করাতাম। এতে তারা আরোগ্য হয়ে যেত।

ঘ. সৈয়্যদুনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে দেখা গেছে যে, তিনি মিম্বর শরীফের যে স্থানটায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসতেন, সেস্থানে হাত রেখে তা চেহারাতে বুলাতেন। (যিক্‌র-ই জামীল)

আম্বিয়া-এ কিরামের স্পর্শধন্য বস্তুতে যেমন অনেক ফায়িয ও বারাকাত রয়েছে, তেমনি তাদের প্রকৃত নায়েব বা ওয়ারেসীনের ব্যবহৃত বস্তুতেও ফায়িয ও বারাকাত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত বেলায়তী তাজের অধিকারী গাউসুল আযম শাহ সূফী মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর তবারুরুক তথা তাঁর ব্যবহৃত বস্তু থেকেও মানুষ এত বেশী ফায়িয ও বারাকাত লাভ করে আসছে যেগুলোর বর্ণনা দেওয়া সাধারণ মানুষের

পক্ষে সাধ্যাতীত। তবুও সংক্ষেপে কটি উল্লেখ করছি।

এক. হযরতের পবিত্র জুতা মোবারকের ধুলার বরকতে কঠিন রোগ থেকে মুক্তি লাভ: 'আয়না-এ বারী' ও গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কারামত গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত মাওলানা কাঞ্চনপুরী (রা.)এর মামা কঠিন কলিজা কামড়ী রোগে ভুগছিলেন। অনেক চিকিৎসার পরও কোন ফল না হওয়ায় মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে হযরত আকদাস (ক.) এর নিকট দু'আর জন্য আসতে মনস্থ করেছিলেন, এমন সময় শামসুজ্জামান ডাক্তার তাকে একটি ওষুধ লিখে দেন। তা দেখে মির্জাপুরী মাওলানা সৈয়দ মছিহুল্লাহ এর পুত্র মৌলভী ফজলুল বারী তাকে বলেন যে, এক নিয়্যতে হযরত আকদাসের জুতা মোবারকের ধুলা মালিশ করলে কামড়ী রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যাবে। এতে তার অত্যন্ত বিশ্বাস হল। তিনি দরবার শরীফ এসে হযরত ক্বিবলা কা'বার জুতা মোবারক থেকে কিছু ধুলো নিয়ে দরদের জায়গায় মালিশ করতে লাগলেন। আল্লাহর রহমতে এবং হযরতের অলৌকিক প্রভাবে তার কামড়ী রোগ চিরতরে চলে যায়। তিনি বলেন, তার শেষ জীবন পর্যন্ত এ কামড়ী রোগ আর হয়নি। এভাবে হযরতের পবিত্র জুতার বরকতে ফায়িয প্রাপ্ত হয়ে বহু লোকের রোগ আরোগ্য হয়।

দুই. তাবাররুক প্রদানে সন্তান লাভ: হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী নিবাসী মাওলানা হাশমত আলী হুগলী গভর্ণমেন্ট হাই স্কুলে হেড় মৌলভী পদে শিক্ষকতা করতেন। তার কোন পুত্র সন্তান ছিলনা। অনেক অলী-বুযুর্গের দরবারে গিয়ে তিনি আল্লাহ পাকের নিকট ফরিয়াদ জানাতেন। কিন্তু কিছুতেই তার তক্বদীর পরিবর্তন হয়নি। তিনি লোকমুখে হযরত আক্বদাসের অনেক বুযুর্গীর কথা শুনে একদিন বৃদ্ধ বয়সে শেষ তদবীর হিসেবে তক্বদীর পরিবর্তনে হযরতের দরবারে আসেন। তিনি হযরতের সামনে হাযির হয়ে তাঁকে কিছু বলার পূর্বে হযরত তার হাতে দু'খানা বাতাসা দিয়ে বলেন, 'তোম্‌কো দো ফুল দিয়া, এক সাদী, দোসেরে নেযামী'। অতঃপর বিদায় নিয়ে তিনি বাড়ী চলে যান। হযরত প্রদত্ত বাতাসা দু'খানা তার স্ত্রীকে খাইয়ে দিলেন। এর চার বছরের মধ্যে তার দু'জন ছেলের জন্ম হয়। তিনি একজনের নাম রাখেন আবুল হায়াত, অপরজনের নাম রাখেন আবু তাহের।

একদা মাওলানা হাশমত আলী বলেন, আমি হযরত আকদাসের এ অপূর্ব অলৌকিক কারামত ও খোদাদাদ শক্তি দেখে অপরিসীম আনন্দিত হলাম এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রত্যহ শোকর আদায় করছিলাম। হযরতের উসীলায় পরম দয়াময় আল্লাহ পাক আমার আশা পূর্ণ করেন। তাঁর প্রতি আমার ভক্তি ও প্রেরণা আসে। আমি ক্রমে তাঁর ভক্ত-শিষ্যে পরিণত হলাম। বর্তমানে ছেলে দু'জনের একজন ইসলামী মাদ্‌রাসায় অন্যজন ইংরেজী স্কুলে লেখা পড়া করে তাঁর দু'আয় একজন প্রসিদ্ধ আলিমে দীন ও অন্যজন কলেজে অধ্যাপনারত।

আমার সাথে ঘটে যাওয়া বিবরণ থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আউলিয়া-এ কিরাম তথা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের স্মৃতি বিজড়িত বস্তু বা স্থানসমূহ বরকতময়। আর এগুলো বরকতময় বিশ্বাস করে তাবাররুক রূপে গ্রহণ করা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে, সাহাবা-এ কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেন এবং পরবর্তী মাযহাবের ইমামদের দ্বারা স্বীকৃত ও সমর্থিত কাজ। তাই আহলে সুন্নাতের অনুসারীরা আল্লাহ প্রদত্ত ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতি বিজড়িত স্থান ও বস্তুগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন এবং সেগুলোকে তাবাররুক বা বরকতময় রূপে গ্রহণ করেন।

অনুরূপভাবে আল্লাহর অলীদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান ও বস্তুসমূহ বরকতময় হওয়া এবং সেগুলোকে তাবাররুক রূপে গ্রহণ করা বর্ণিত দলিলাদি থেকে প্রমাণিত হয়।

তথ্যসূত্র:

১. তাফসীর-ই খাজাইনুল ইরফান।
২. তাফসীর-ই নাঈমী।
৩. যিক্‌র-ই জামীল - মাওলানা মহীউদ্দীন অনুদিত।
৪. তাবাররুক সম্পর্কীয় রেসালা - মাওলানা এম এ মান্নান।
৫. আয়না-ই বারী।
৬. গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কারামত।

ঈমান ও আখলাক ঃ পর্ব-১৯
(শেষ অংশ)
• সৈয়দ মুহাম্মদ ফখরুল আবেদীন (রায়হান) •

হযরত রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন ধর্মের উপর টিকে থাকা এতই কষ্টকর হয়ে পড়বে যেমন জলন্ত আগুনের টুকরা হাতে রাখা"। হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের উপর যখন তরবারী স্থাপন করা হবে, তা কেয়ামত পর্যন্ত আর উঠবে না এবং মহাপ্রলয় ঘটবে না, যে পর্যন্ত আমার উম্মতের কতেক সম্প্রদায় কাফেরদের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকবে এবং যে পর্যন্ত আমার উম্মতের কতেক সম্প্রদায় মুর্তিপূজা না করবে। শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্য হতে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী বের হবে। তাদের মধ্যে এই ধারণা জন্মাবে যে, সে আল্লাহর নবী। কিন্তু আমিই সর্বশেষ নবী। আমার পরে আর কোন নবী হবে না। আর আমার উম্মতের মধ্যে একদল প্রকাশ্য সত্যের উপর অটল থাকবে, যারা তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করবে, তারা আল্লাহর নির্দেশনা আসা পর্যন্ত তাদেরকে কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। (তিরমিযী শরিফ) হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এমন এক সময় আসবে যখন কাফের সম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরকে মুসলিম অধিকৃত দেশগুলি দখল করার জন্য এমনভাবে আমন্ত্রণ জানাবে, যেমন দস্তরখানে খাদ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুসলমানদের সংখ্যা কি তখন খুবই কমে যাবে, প্রত্যুত্তরে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না বরং তোমাদের সংখ্যা অধিক হবে, কিন্তু এমনই ভিত্তিহীন হবে যেমন ঘুর্ণিঝড়ের সময় ধূলা বালুর হয়ে থাকে এবং তোমাদের ভয়, প্রতাপ দুশমনদের অন্তর হতে দূর হয়ে যাবে এবং তোমাদের অন্তরে অলসতা দানা বাঁধবে। এমন সময় জনৈক সাহাবী আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অলসতা কী জিনিস? তিনি উত্তর করলেন, তোমরা দুনিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবে এবং মৃত্যুকে ভয় করতে থাকবে। (আবু দাউদ, আহমদ ও বায়হাকী শরীফ) নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন, খ্রিস্টানরা কনস্টান্টিনোপল দখল করবার পর তাদের বিরোধীয় উভয় দলের মধ্যে পুনরায় সখ্যতা ও মিত্রতা স্থাপিত হবে এবং তারা সম্মিলিতভাবে প্রবলভাবে সিরিয়া আক্রমণ করবে ফলে যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজয় বরণ করবে ও মদীনার অদূরে খায়বর পর্যন্ত নাসারাদের আধিপত্য স্থাপিত হবে। (আবু দাউদ ও বায়হাকী শরীফ) এই সময় ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব নিকটবর্তী হবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাহদী সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি ইরশাদ করেন, মাহদী বরহক। তিনি হবেন সৈয়্যদা ফাতিমাতুয যাহরা (রা.) এর বংশধর। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, মাহদীর নাম হবে মুহাম্মদ, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, মাহদী হবেন আমারই পরিবারস্থ (আহলে বায়ত)। তিনি আমার সুন্নাত বাস্তবায়নে যুদ্ধ করবেন, যেমনিভাবে আমি আল্লাহর অহীর অনুসরণে জিহাদ করেছি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি পৃথিবীর (বয়স) একরাতও অবশিষ্ট থাকে, তবুও আল্লাহ তাআলা সে রাতটিকে দীর্ঘায়িত করে দিবেন, যেন আমার বংশ হতে একজন পুরুষ রাজত্ব করেন। তাঁর নাম হবে আমার নামে (মুহাম্মদ) এবং পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে (আব্দুল্লাহ)। পৃথিবীতে তিনি আদল-ইনসাফ তথা ন্যায়-নীতি ও সাম্য দিয়ে ভরিয়ে দিবেন, যেভাবে তা পূর্বে যুলুম-অত্যাচারে পূর্ণ ছিল। তিনি প্রচুর পরিমাণ সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দেবেন। আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের হৃদয়ে প্রাচুর্য মনোভাব দিবেন। তিনি রাজত্ব করবেন সাত কিংবা নয় বছর পর্যন্ত। অতঃপর মাহদীর পরবর্তীতে কোনরূপ কল্যাণ

অবশিষ্ট থাকবে না। হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মাহদী কি আমাদের মুহাম্মদী বংশে আসবেন না ভিন্ন কোন বংশ থেকে? উত্তরে তিনি ইরশাদ করেন, না, বরং তিনি আমাদেরই বংশে আসবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দিয়ে সেভাবেই দীন সমাপ্ত করবেন, যেভাবে তা আরম্ভ করা হয়েছিল আমাদের দিয়ে। আমাদের দিয়েই লোকজনকে ফিতনা থেকে পরিত্রাণ দেয়া হবে। যেভাবে তাদেরকে শিরক থেকে পরিত্রাণ দেয়া হয়েছিল। আমাদের দিয়েই আল্লাহ তাআলা ফিত্‌নার পারস্পরিক শত্রুতার পর তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিবেন, যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা শিরকের অক্টোপাস থেকে তাদের অন্তরগুলোতে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেন। আমাদেরই মাধ্যমে ফিত্‌না ফ্যাসাদ, হানাহানির পর লোকেরা পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাবে। যেমনিভাবে তারা শিরকের হানাহানির পর দীন ইসলামে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ হয়েছিল। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর মাথায় পাগড়ী থাকবে। অতঃপর একজন আহ্বায়ক আহ্বান করতে করতে এসে বলবেন, এ মাহদী হলেন আল্লাহ্‌র খলীফা। সুতরাং তোমরা সকলেই তাঁর আনুগত্য কর। হযরত কা'আব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে পূর্বাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় লেজবিশিষ্ট একটি নক্ষত্র উদীত হবে। হযরত শোরাইক (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট এ সংবাদ এসেছে যে, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হবে। হযরত আলী মরতুজা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আসমান হতে আহ্বানকারী আহ্বান করবেন যে, ধ্রুব সত্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশের মধ্যেই নিহিত। তখন লোকজনের মুখে মুখে ইমাম মাহদীর প্রকাশ হয়ে থাকবে। লোকদের অন্তরে তার প্রতি আন্তরিকতা ও ভালবাসা স্থাপন করিয়ে দেয়া হবে। তাদের মুখে একমাত্র তার কথা ব্যতীত অন্য কারো আলোচনা থাকবে না। হযরত শাহ রফী উদ্দীন (র.) বলেন, মুসলমানদের বাদশাহ শহীদ হওয়ার পর সিরিয়া খ্রিষ্টানদের কাতারে চলে যাবে এবং খ্রিষ্টান বিবদমান দু'দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হবে। অবশিষ্ট মুসলমানরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করবে। খ্রিষ্টানদের আধিপত্য খায়বর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এ সময় মুসলমানগণ ইমাম মাহদীর সন্ধান করতে থাকবে। যেন তাঁর নেতৃত্বে আপাতত সমস্যা থেকে মুক্তি ও শত্রুদের হাত থেকে রেহাই লাভ করতে পারে। এ অবস্থা চলাকালীন ইমাম মাহদী মদীনাতেই অবস্থানরত থাকবেন। কিন্তু তিনি যিম্মাদারী অর্পিত হওয়ার আশঙ্কায় মক্কা শরীফ চলে যাবেন। সেখানেও তৎকালের ওলী-আবদালগণ ইমাম মাহদীর সন্ধানে থাকবেন। ইত্যবসরে কতিপয় ব্যক্তি নিজেদেরকে মাহদী বলে মিথ্যা দাবি করতে থাকবে। ইতিমধ্যে একদিন রুকনে ইয়েমনী ও মকামে ইব্রাহীমের মাঝে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফের মুহূর্তে লোকজন প্রকৃত ইমাম মাহদীকে চিনে ফেলবে এবং তাঁর হাতে বায়আতের জন্য তাঁকে বাধ্য করবে। এ ঘটনা সত্য হওয়ার একটি চিহ্ন হবে এমন যে, যার পূর্বেকার রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে এবং বায়আতের মুহূর্তে অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ আসবে যে, 'হাযা খলীফাতুল্লাহিল মাহদীয়্যু ফাসতামিউ লাহু ওয়া আতিউ'। আওয়াজটি সেখান থেকে সকলেই শুনতে পাবে। এ সময় ইমাম মাহদীর বয়স হবে চল্লিশ বছর। হাদীস শরীফে আরও আছে ইমাম মাহদীর বাইআত ও খেলাফত প্রকাশ হয়ে পড়লে মদীনার মুসলিম বাহিনী মক্কা শরীফে চলে আসবে। শাম তথা সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেন ও অন্যান্য স্থানের অলী আল্লাহ ও আবদালরা তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন এবং আরবের অসংখ্য লোক তাঁর সেনাবাহিনীতে যোগদান করবে। তারপর ইমাম মাহদী কাবা শরীফে রক্ষিত গুপ্তধন বের করবেন, এই গুপ্তধন 'তাজুল কা'বা' নামে অভিহিত। উক্ত ধন তিনি মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করে দেবেন। এমন সময় সেনাপতি মানছুর একদল সৈন্য নিয়ে ইমাম মাহদীর সাহায্যার্থে মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা হবেন। আসার পথে তিনি অসংখ্য খ্রিষ্টান এবং বিধর্মীকে ধ্বংস করে মক্কা শরীফে আগমন করবেন এবং ইমাম মাহদীর হাতে বায়আত গ্রহণ করবেন। সুফিয়ানী যার মাতুল বংশ বনু কালব হবে সে ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করবে। এই সৈন্যদল মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে একটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান গ্রহণ করবে। তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে তাদের সকলেই মাটিতে ধসে যাবে। শুধু দুইটি লোক বেঁচে থাকবে। তন্মধ্যে একজন ইমাম মাহদীকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করবে এবং অপর লোকটি নবী বংশের শত্রু সুফিয়ানীকে এই সংবাদ জানাবে। হাদীস শরীফে আছে ইমাম মাহদী বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনীসহ সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক নগরীর উপকণ্ঠে পৌঁছে যাবেন।

দামেস্কের নিকটবর্তী একস্থানে খ্রিষ্টানদের সাথে তার ভীষণ যুদ্ধ হবে। এই সময় ইমাম মাহদীর সেনাবাহিনী তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তাদের একদল নাসারাদের ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করবে। আল্লাহ পাক তাদের তওবা কখনও কবুল করবেন না। অবশিষ্ট সৈন্যদের একদল যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যাবে এবং অবশিষ্টরা যুদ্ধ করে জয়লাভ করবে। যারা এই যুদ্ধে শহীদ হবে। তাঁরা অহুদ ও বদর যুদ্ধে শাহাদত প্রাপ্ত সাহাবিগণের মর্যাদা লাভ করবে। এই যুদ্ধের পর ইমাম মাহদী দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। চতুর্দিকে তিনি সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করবেন। মুসলিম সৈন্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনমনীয় মনোবল ও সহযোগিতার ফলে সারাদেশে পুনরায় শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হবে। এর অব্যবহিত পরেই তিনি খ্রিস্টান অধিকৃত কন্সটান্টিনোপল পুনরুদ্ধারের জন্য রওয়ানা হবেন। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী বনি ইসহাক সম্প্রদায়ের সত্তর হাজার মুসলিম মুজাহিদকে জাহাজযোগে তথায় প্রেরণ করবেন। মুসলিম বাহিনী সেখানে অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করবেনা; বরং তারা শহরের পরিখার নিকটবর্তী হয়ে সম্মিলিতভাবে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করবেন। এক একবার তকবীরের সাথে সাথে নগর প্রাচীরের এক এক অংশ ধসে পড়তে থাকবে। সেই প্রাচীর সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর শহরের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত হয়ে পড়বে। মুসলিম মুজাহিদগণ পরম আনন্দের সাথে বিজয় উল্লাস করতে করতে বীরদর্পে শহরে প্রবেশ করবে। ইমাম মাহদী বিনা বাধায় নগর দখল করে সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করবেন। হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মাহদী আমার বংশ থেকে আবির্ভূত হবেন। তাঁর গায়ের রং হবে আরবদের অনুরূপ। শারীরিক গড়ন হবে ইসরাঈলী ধাচের। তাঁর বাম কপোলে (গালে) তিল থাকবে, তা হবে আলোকোজ্জল নক্ষত্রের ন্যায়। (মাহদী) পৃথিবীকে ন্যায়-নীতি দ্বারা পূর্ণ করবেন, যেভাবে তা পূর্বে যুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর রাজত্বে আসমান ও যমীনবাসী সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। এমনকি আকাশের পাখ-পাখালীরা পর্যন্ত তুষ্ট থাকবে। অপর একখানা হাদীসে হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) যখন অবতরণ করবেন তখন ইমাম মাহদী দেখতে পাবেন যেন মাথার চুল থেকে পানি ঝরছে। মাহদী তখন তাঁকে বলবেন, আসুন এবং নামাযের ইমামতি করুন। হযরত ঈসা (আ.) বলবেন, আপনি নামায পড়াবেন বলে ইকামত হয়ে গেছে, কাজেই আপনিই নামায পড়ান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ কথা বলে হযরত ঈসা (আ.) তখন আমার পরবর্তী বংশধরদের একজনের পেছনে নামায আদায় করবেন। পাশাপাশি, মসীহ দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ কিয়ামতের অন্যতম আলামত। দাজ্জালের নাম কায্যাব বা মিথ্যাবাদীও বলা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের যেসব নিদর্শন তথা আলামতের সংবাদ দিয়েছেন, যেমন, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, ইয়াজুজ মাজুজ বের হওয়া, আকাশ হতে হযরত ঈসা (আ.) এর অবতরণ এবং পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া, এগুলো সত্য। কেননা এগুলোর সংবাদ সত্যবাদী নবী আমাদের দিয়েছেন। হযরত হুযায়ফা ইবনে উসাইদ আল গিফারী (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করেন, আমরা তখন পরস্পর কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছ? আমরা বললাম, কিয়ামতের ব্যাপারে আমরা আলোচনা করছি। তিনি তখন বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত দশটি চিহ্ন প্রকাশ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দশটি চিহ্নের কথা উল্লেখ করেন। ১. ধোঁয়া দেখা, ২. দাজ্জালের আবির্ভাব, ৩. দাব্বাতুল আরদের প্রকাশ, ৪. পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া, ৫. হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) এর অবতরণ, ৬. ইয়াজুজ মাজুজের আত্মপ্রকাশ তিনটি চন্দ্রগ্রহণ বা ভূমিধস, ৭. একটি প্রাচ্যে, ৮. একটি পাশ্চাত্যে, ৯. একটি আরব উপদ্বীপে, ১০. সর্বশেষটি হলো আগুন যা ইয়েমেন থেকে বের হয়ে হাশরের মাঠের দিকে মানবমন্ডলীকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত আদমের (আ.) সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত দাজ্জালের ফিত্না অপেক্ষা ভীষণ বিপদের আর কিছুই হবে না। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, যদি আমি দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত থাকি, তাহলে আমিই তার মোকাবেলা করে জয়লাভ করব এবং যদি না থাকি তা হলে তোমরা সকলেই তার ধোঁকা হতে আত্মরক্ষা করার জন্য প্রস্তুত থেকো। দাজ্জালের ফিত্নার সময় তোমরা সূরা কাহাফের প্রথম কয়টি আয়াত

পাঠ করিও, তা তোমাদের জন্য সেই সময়কার রক্ষাকবচ হবে। তিনি আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, দাজ্জাল প্রথমতঃ ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী রেস্তাবাক নামক স্থান হতে আত্মপ্রকাশ করবে। পরে সেখান হতে ইস্পাহান যাবে এবং তথাকার সত্তর হাজার ইহুদী তার প্রতি ঈমান আনবে। তার গতি এতই দ্রুত হবে যে, প্রবল বায়ু দ্বারা পরিচালিত মেঘের ন্যায় সে পৃথিবী পরিভ্রমণ করবে। যারা তাকে খোদা বলে স্বীকার করবে। তাদের জন্য দাজ্জালের নির্দেশ মত বৃষ্টিপাত হবে, গাছে ফল ধরবে, ক্ষেতগুলি ফলে ফসলে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে পশু মোটাতাজা হবে, দুগ্ধবতী পশুর দুধ বৃদ্ধি পাবে, মাটির নীচের ধনরাশি ফেটে উত্থিত হবে, এই ধন সে অনুগামীদেরকে বিলিয়ে দেবে। যারা তাকে খোদা বলে মানবে না তারা যে কেবল তার কথিত দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে তা-ই নয়, বরং তাদের উপর নানা রকম অকথ্য উৎপীড়ন করা হবে। দাজ্জালের নির্দেশে তাদের ধন সম্পত্তি বিনষ্ট করা হবে। সেই মহা সংকটের সময় বিশ্বাসী বান্দারা আল্লাহর জিকির করেই স্বীয় ক্ষুধা নিবৃত্ত করবেন। দাজ্জাল মক্কা শরীফ ও মদীনা শরিফ ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করবে। মদীনায় প্রবেশের জন্য মদীনার নিকটস্থ প্রস্তরময় ভুখণ্ডে অবতরণ করবে। এ সময় মদীনার সাতটি প্রবেশ দ্বার থাকবে। কিন্তু দাজ্জাল তন্মধ্যে কোন দ্বার দিয়েই প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। অবশেষে ফিরে চলে যাবে। তার দৌরাত্মকাল হবে ৪০দিন, তন্মধ্যে প্রথম দিনটি এক বছরের মত দীর্ঘ হবে। দ্বিতীয় দিনটি এক মাসের মত লম্বা এবং তৃতীয় দিনটি এক সপ্তাহের মত দীর্ঘ হবে এবং অন্যান্য দিনগুলি সাধারণ দিনের মত লম্বা হবে। (অর্থাৎ দাজ্জাল ৪৩০ দিন দুনিয়াতে অত্যাচার চালাবে)। হযরত ঈসা (আ.) পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এটা অকাট্য সত্য। আল্লাহর অপার কুদরতের নিদর্শন স্বরূপ তিনি ব্যতিক্রমধর্মী পিতাবিহীন জন্মগ্রহণ করেছেন। পৃথিবীতে তিনি নির্ধারিত সময় অবস্থান করেছিলেন। এরপর তাঁকে জীবিতাবস্থায় সশরীরে আসমানে তুলে নেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যু হয়নি। কিয়ামতের প্রাক্কালে উম্মতে মুহাম্মদী হিসাবে পুনরায় তিনি আগমন করবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন, ইয়াজুজ মাজুজের জন্য বদদোয়া করবেন, ইমাম মাহদীর (আ.) জানাযার নামায পড়াবেন। দাজ্জাল নিধনের পর ইমাম মাহদী (আ.) সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবেন। ইমাম মাহদীর খেলাফতকাল হবে সাত কিংবা নয় বছর। ইমাম মাহদী (আ.) এর ইন্তিকালের পর যাবতীয় ছোট বড় কাজের ভার হযরত ঈসা (আ.) এর উপর ন্যস্ত হবে। এরপর দেখা দেবে ইয়াজুজ ও মাজুজের এক মহাবিপদ। তাদের কথা সূরা কাহাফে বিবৃত হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) এর নেতৃত্বে ঈমানদারা তুর পাহাড়ে আশ্রয় নেবে। তারপর হযরত ঈসা (আ.) এর বদদোয়ার ফলে ইয়াজুজ মাজুজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তারপর পৃথিবী শান্তির বাগানে পরিণত হবে। এরপর হযরত ঈসা (আ.) এর ওফাতের পর কিয়ামতের অন্যান্য আলামত যেমন, ভূমি ধস, কালো ধোঁয়ার প্রকাশ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, দাব্বাতুল আরদের প্রকাশ, দক্ষিণের শীতল বাতাস ও ইয়েমেন হতে অগ্নি বের হয়ে মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়ার পর কেউ ঈমান আনয়ন করলে বা তওবা করলেও তা কবুল হবে না। তখন তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর যথাসময়ে আল্লাহর নির্দেশ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হযরত ইসরাফিল (আ.) এর সিঙ্গার ফুৎকারে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে দ্বিতীয়বার সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হলে মানুষ জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে ছুটতে থাকবে। যেই শরীরে যেই রূহ ছিল সেই শরীর এবং সেই রূহের একই সঙ্গে হাশর হবে, হাশরের জন্য কোন নতুন রূহ ও শরীর গঠন করা হবেনা। আল্লাহ আমাদের তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত হিসাবে হাশরের ময়দানে লেওয়ায়ে হামদের ছায়াতলে স্থান দান করুন। আমিন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. শরহুল আক্বিদাতিত তাহাবিয়্যাহ,
২. শারহু আক্বাইদিন নাসাফিয়্যাহ,
৩. ইমাম মাহদী,
৪. বাহারে শরীয়ত,
৫. ঈমান সংক্রান্ত মাসয়ালা-মাসায়িল।

সাধনের কায়দা জানা চাই, বেকায়দায় করলে সাধন মাওলা রাজি নাই

বিসমিল্লাহ্ শরীফের তাযীম এবং অনর্থ পরিহার প্রসঙ্গ

• মাওলানা কাজী মোহাম্মদ হাবিবুল হোসাইন •

পূর্ব প্রকাশের পর:

তাযীম: বিসমিল্লাহ্ শরীফ এক মহা নেয়ামত। যে কোন কাজ বিসমিল্লাহ্ দিয়ে শুরু করলে অবশ্যই এর ফজিলত রয়েছে। আর বিসমিল্লাহ্ ব্যতীত কোন কাজ শুরু করলে এতে বরকত থাকেনা। পবিত্র হাদীস শরীফে এর অনেক ফযীলতের কথা রয়েছে। রাসূল (দঃ) বলেন তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করতে, বিসমিল্লাহ্ বলবে, বাতি নেভাতেও বিসমিল্লাহ্ বলবে, পাত্র আবৃত করতে, কোন কিছু খেতে, পানি পান করতে, ওযু করতে, সাওয়ারীতে আরোহন করতে এবং তা থেকে অবতরণকালেও বিসমিল্লাহ্ বলবে। তাতে বরকত লাভ হবে। (কুরতুবী)

আর বিসমিল্লাহ শরীফের তাযীম ও হেদায়তের দিকেও নজর রাখতে হবে। কেননা কোন কোন পোস্টার, লিফলেটে দেখা যায় আরবিতে বিসমিল্লাহ্ লেখা। এটা বিভিন্ন দেওয়ালে, রাস্তার আশেপাশে টাঙ্গানো হয়। পরে পোস্টার ছিঁড়ে যায় বা কেউ ছিঁড়ে ফেলে। ফলে এটা রাস্তায় পড়ে থাকে পথচারীর পায়ে পড়ে তাযীমের খেলাফ হয়। এতে করে আয়োজনকারী কিংবা পোস্টার লাগানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির উপর এ গুনাহ্র ভারটা আসে। তাই পোস্টার লিফলেটের শিরোভাগে ৭৮৬ কিংবা কিছু না লিখলে বা শুধু বাংলায় লিখলে তাসমিয়ার তাজিমটা রক্ষা হয়।

অপচয় বা অনর্থ পরিহার:

তরিকতপন্থীদের জন্য অনর্থ পরিহার আবশ্যক। নবী রাসূল ও ওলিয়ে কামিলরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য বিভিন্ন স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন। তদ্রুপ সময় ও যুগের চাহিদানুযায়ী হযরত গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তার জবানী বাণী এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে উপস্থাপিত উসুলে সাবআ বা সপ্তপদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে মানবজীবনের জন্য এক নিখুঁত, সহজ সরল পন্থার প্রবর্তন করেছেন।

এই সপ্তপদ্ধতি হল ফানায়ে সালাসা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর বা তিন প্রকারের ফানা। আর মউতে আরবা বা ৪ প্রকারের মৃত্যু। এই সপ্ত পদ্ধতি সকল তরিকতপন্থীদের নিকট অনুশীলনযোগ্য সমাদৃত ও স্বীকৃত হয়ে আসছে। সর্বসাধারণের উপকারার্থে নির্বিঘ্ন বা সহজসাধ্য উপায় এই সাত নীতি।

এই সপ্তপদ্ধতির অন্যতম হল ২য় প্রকারের ফানা যা ফানা আনিল হাওয়া বা অনর্থ পরিহার। অর্থাৎ যা না হলেও চলে সেরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। অহেতুক অযথা কাজকর্ম থেকে বিরত থাকলে জীবনযাত্রার পথ সহজ ও ঝামেলামুক্ত হয়। কেউ সমালোচনা করতে পারেনা। পবিত্র কুরআন মতে যে কেউ অনর্থ পরিহার করে তার নিশ্চিত স্বর্গবাস হয়, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষাই হচ্ছে মানুষের মৌলিক চাহিদা। এর অতিরিক্ত ভোগবিলাস, লোভলালসা পৃথিবীর মধ্যে আত্মঘাতী সংঘর্ষ সৃষ্টি করছে। তাই মাইজভাণ্ডারী দর্শনভিত্তিক গাউসিয়াত নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে চাহিদার অতিরিক্ত সব অনর্থ পরিহার করে শোষণহীন বিশৃংখলহীন সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। (বিস্তারিত দেখুন- অছিয়ে গাউসুল আযম মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী লিখিত 'বেলায়তে মোতলাকা') [মাইজভাণ্ডারী দর্শনের মুক্তির সপ্তপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী লিখিত 'বেলায়তে মোতলাকা' কিতাব ৬৯ পৃষ্ঠা দেখুন]

অহেতুক মাইক বাজানো:

সরেজমিনে দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় মিলাদ মাহফিল হচ্ছে কিংবা উরস বা উরসে হাদিয়া আনার সময় বা দরবারে আসার সময় গাড়ির উপরে মাইক বেঁধে শুধু শুধু বাজানো হয়। আবার কোন কোন জায়গায় দেখা যায় মাহফিল হবে রাতে। কিন্তু দিনের শুরু থেকে মাইক এনে সারাদিন অহেতুক বাজানো হয়। অনেক জায়গায় খোঁজ নিয়ে দেখেছি ১-২ ঘণ্টার জন্য কতগুলো মাইক এনে সারা দিন ক্যাসেট বাজানো হয়। আশপাশের মানুষগুলো কোন কাজ করতে পারেনা। ফলে সবাই সমালোচনা করতে দ্বিধা করেনা।

মিতব্যয়িতা:

মিতব্যয়িতা হলো প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করা,

পরিমিতবোধ, কথা-বার্তা কাজ-কর্মে যথার্থতা, ধন-সম্পদের যথাযথ ব্যবহার। ধনসম্পদের যথাযথ ও প্রয়োজনমাফিক ব্যবহার অর্থাৎ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই বলা, খরচ করা কম-বেশি না করা ইত্যাদি। আল্লাহ্ আমাদেরকে অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছেন, এ সমস্ত নিয়ামত ধনসম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে অপব্যয়-অপচয় বা কৃপণতা না করা বরং যখন যা প্রয়োজন সেরূপ ব্যয় করার মধ্যেই রয়েছে সফলতা। প্রয়োজন মাফিক সম্পদ ব্যয় কথা কাজ ইত্যাদি করাই হলো কৃপণতা ও অপচয়ের মাঝামাঝি।

অথচ মিতব্যয়িতা বা প্রয়োজন মাফিক ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক গুণ। এটি সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে। পক্ষান্তরে অপচয়, অপব্যয় অহেতুক কাজ সমাজে নানা অশান্তি সৃষ্টি করে। ফলে সমাজে নানা সমালোচনা সৃষ্টি হয়।

মিতব্যয়িতা মানুষকে অপচয় ও কৃপণতার হাত থেকে রক্ষা করে। রাসূলুল্লাহ্ (দ.) ইরশাদ করেছেন,

من فقه الرجل رفقه فى معيشته۔

অর্থাৎ, ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ। (মুসনাদে আহমদ)

মিতব্যয়ি লোক আল্লাহ্র নিয়ামতের যথাযথ ব্যবহার করেন। এতে বহু সওয়াবের অধিকারী হয়।

প্রিয় নবী (দ.) ইরশাদ করেছেন: হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সৎকাজে খরচ কর, তবে তোমার কল্যাণ হবে। আর যদি তা আটকে রাখ তবে তোমার অকল্যাণ হবে। তবে তোমার প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ রেখে দিলে তোমাকে তিরস্কার করা হবেনা। (তিরমিযী শরীফ)

প্রয়োজন মাফিক খরচ মুমিনের গুণ। প্রকৃত ঈমানদাররা শুধু নিজ প্রয়োজন মাফিক খরচ করেন। তারা কৃপণতাও করেন না আবার অপচয়ও করেন না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন-

والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔

অর্থ: আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। তারা অহেতুক অযথা কাজ করে মানুষকে কষ্ট দেয় না।

আল্লাহ্ পাক আরো বলেন:

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔

অর্থাৎ, তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়োনা এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়োনা তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। (সূরা বনী ইসরাঈল: ২৯)

বিশৃঙ্খল খরচ নিষিদ্ধ: আলোচ্য আয়াতে বিশৃঙ্খল খরচ করতে নিষেধ করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ অবস্থা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যা কিছু হাতে আছে, তৎক্ষণাৎ তা খরচ করে ফেলা এবং আগামীকাল কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এলে অথবা ধর্মীয় প্রয়োজন দেখা দিলে অক্ষম হয়ে পড়া এটাই বিশৃঙ্খলা। অথবা তা খরচ করার পর পরিবার পরিজনের ওয়াজিব হক আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়াও বিশৃঙ্খলা। (মাজহারী)

(পক্ষান্তরে যে অপচয় করে তাকে শয়তানের সাথে তুলনা করা হয়েছে।)

আত্মীয়স্বজনের হকের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وات ذاالقربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا۔ ان المبذرين كانو اخوان الشياطين۔

অর্থাৎ, আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অবাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করোনা। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারিরা শয়তানের ভাই। (সূরা বনি ইসরাঈল: ২৭)

রাসূল (দ.) সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন তোমরা অযুর পানি নষ্ট করোনা প্রয়োজনে অতিরিক্ত ১ ফোঁটা পানিও অপচয় করবেনা।

কালাম পরিবেশনের সময় শায়েরের নাম বাদ দেয়া:

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাওয়াল কর্তৃক কালাম পরিবেশনের সময় দেখা যায়, কোন কোন কালাম পরিবেশনের শেষের দিকে "দাসে বলে" অমুক বলে ... শায়েরের নামটা আর নেন না। কেন? এতক্ষণ তার লেখা কালাম শুনলাম তার শে'র দিয়ে যিক্র মাহফিল করলাম কিন্তু তার নাম নিতে অসুবিধা কোথায়? এটা বোধগম্য নয়। তার নাম না নিলে তার শে'রও শুনা ছাড়বেন, বস্তুতপক্ষে মাইজভাণ্ডারী তরিকতের অঙ্গনে অধিকাংশ শে'র খলিফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কিংবা খলিফায়ে বাবা ভাণ্ডারী (ক.) কিবলা কাবারা লিখেছেন এবং হযরত বাবাজানকে তারা দেখে দেখে পড়েছেন বা লিখেছেন। আর তাদের প্রতি হযরত বাবাজানও সন্তুষ্ট ছিলেন। এজন্য সংশ্লিষ্ট কাওয়াল বা শায়েরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এতে দু'ধরনের উপকারিতা, ১টি হলো লেখকও

আপনার জন্য দোয়া করবেন এবং মাহফিলও ভাবগম্ভীর হয়।

যিকির মাহফিলে কালাম, এক সাথে না গাওয়া:

বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় বিশেষ করে সেমা মাহফিল চলার সময় কাওয়ালের/শিল্পীর সাথে একসাথে শে'র পড়তে। এতে করে এক পর্যায়ে দেখা যায় শিল্পী কী পড়ে শ্রোতারা বুঝেনা, শ্রোতারা কী পড়ে শিল্পী বুঝেনা। এ কারণে মাহফিলের ভাবগাম্ভীর্য নষ্ট হয়। একাগ্রচিত্তে মাহফিল করা যায় না (এ জন্য কালাম না জানলে শিল্পীর সাথে না পড়াই ভাল)। কেউ আল্লাহ্ বললে কেউ গাউসুল আযম বলে। কেউ গাউসুল আযম বললে কেউ গাউসুল আযম অমুক বাবা বলে, ফলে মাহফিলে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। তাই সংশ্লিষ্ট আয়োজনকারী বা শ্রোতা মন্ডলী এদিকে লক্ষ্য রাখলে মাহফিল আরো ভাবগম্ভীর হবে বলে মনে হয়।

মুনাজাত-এ বিনয়:

মোনাজাত অর্থ প্রার্থনা অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে অনুনয় ও বিনীতভাবে কোন কিছু চাওয়া। আল্লাহ্ বলেন:

ادعونى استجب لكم

তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। আল্লাহ্কে কিভাবে ডাকবো? বিভিন্নভাবে আল্লাহ্কে ডাকা যায়, নামায, তিলাওয়াত, তাসবীহ্, ইসতিগফার, মীলাদ, কিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে।

তবে যখনই দু'হাত তুলে আল্লাহ্ পাকের কাছে কিছু দরখাস্ত করা হয় তখন অত্যন্ত কাতর স্বরে, বিনয়ভাবে চাইতে হয়। আল্লাহ্ পাক বলেন: تدعونه تضرعا وخفية

অর্থ, তোমরা তাঁকে অত্যন্ত বিনীতভাবে ও গোপনে আহ্বান কর। (সূরা আনআম : ৬৩)

অর্থাৎ, অত্যন্ত নম্রভদ্রভাবে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্কে ডাক তাহলে তোমার দরখাস্ত আল্লাহ্ পাক দয়া করে কবুল করবেন।

কিন্তু কোন কোন জায়গায় দেখা যায় মুনাজাত করার সময় এমনভাবে রেগে যান যেন, তিনি আল্লাহ্র সাথে রীতিমত যুদ্ধে নেমেছেন কিংবা কারো সাথে ঝগড়া করছেন। শুধু চিল্লানোর শব্দ শুনতে পাবেন। আর তখন তিনি কী বলছেন তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝতে সক্ষম নন।

অথচ আল্লাহ্ পাককে যত বিনয় সহকারে ডাকে তিনি তত দয়াদানে বান্দাকে ধন্য করেন। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে বিনয় সহকারে ডাকার তাউফীক দিন। আমীন।

প্রখ্যাত কাওয়াল সৈয়দ আমিনুল ইসলামের ইন্তিকালে ইসলামী সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া

আলোকধারা ডেস্ক: উপমহাদেশের বিখ্যাত কাওয়াল সম্রাট, ইসলামী সাংস্কৃতিক জগতের অন্যতম পুরোধা, গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর ফায়িযপ্রাপ্ত সৈয়দ আবু আহমদ প্রকাশ আবু কাওয়াল (রাহ.)-এর সুযোগ্য পুত্র দেশবরেণ্য প্রসিদ্ধ কাওয়াল সৈয়দ আমিনুল ইসলাম গত ২২ এপ্রিল শুক্রবার বা'দ মাগরিব ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

৬৬ বছর বয়সে ইন্তিকালের সময় তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ২ কন্যা, বহু আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহী, কাওয়াল শাগরিদ রেখে যান। পরদিন বা'দ যুহর চট্টগ্রাম জমিয়াতুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। নামাযে ইমামতি করেন খতীব অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আলকাদেরী। পরে তাঁকে চুনতী শাহ্ মনযিল কবরস্থানে দাফন করা হয়।

তাঁর ইন্তিকালে ইসলামী সাংস্কৃতিক অঙ্গন, দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন দরবারের খানকাহ্ ও কাওয়াল সমাজে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর ইন্তিকালে সমাজ একজন প্রথিতযশা শায়ের, সুরকার ও অসাধারণ প্রতিভাবান কাওয়ালকে হারাল। তাঁর শূন্যতা সহজে পুরণীয় নয়। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকাহত পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট

(SZHM Trust)

দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল)

২০০৩ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত যাকাত বিতরণ বিবরণী

প্রকল্প খাত	জন/সংখ্যা	টাকা
রিক্শা প্রদান	১৯	৪,৯৮,০৪৫
আর্থিক সহায়তা	১৭০	১২,৮৩,৮৭৬
বিদেশ গমণে সহায়তা	১৬	৯,১০,০০০
সেলাই মেশিন প্রদান	০১	৫,০০০
ব্যবসায় পূঁজি সহায়তা	১৫৯	৬২,০২,০০০
কলের লাঙ্গল প্রদান	২৪	২৪,১৪,০০০
ট্রলি গাড়ী প্রদান	০৪	৪,০০,০০০
ইট ভাঙ্গার মেশিন	০২	২,০০,০০০
ফুড মেশিন প্রদান	০১	৪০,০০০
সেচ পাম্প প্রদান	০৪	৯৫,০০০
মুরগির খামার	০৬	৪,৩০,০০৯
গবাদি পশুর খামার	২০	১১,১০,০০০
মৎস্য খামার	১০	৪,৩০,০০০
কম্পিউটার প্রদান	০৩	১,৭৫,০০০
ঋণ পরিশোধে সহায়তা	২৬	৮,৩০,০০০
সি এন জি ট্যাক্সি ক্রয়ে সহায়তা	০৩	৩,০০,০০০
পুরাতন মটরকার ক্রয়ে সহায়তা	০১	৭৫,০০০
হাঁসের খামার	০১	২০,০০০
জাল ও নৌকা ক্রয়	০১	৪০,০০০
মোট	৪৭১ জন	১,৫৪,৫৭,৯৩০ টাকা
সাধারণ খাত	**জন/সংখ্যা**	**টাকা**
গৃহ নির্মাণে সহায়তা	২৮১	৩১,৮৫,০০০
চিকিৎসা সহায়তা	১৩৩	১৩,৭৫,০০০
বিবাহ সহায়তা	৩১৭	৬৭,৫০,০০০
শিক্ষা সহায়তা	৭১	৪,৭২,০০০
মোট	৮০২ জন	১,১৭,৮২,০০০ টাকা

১৩ বছরে ১৪ পর্বে (২০০৩-২০১৫) সর্বমোট (৪৭১+৮০২) = ১২৭৩ জনকে বিতরণ করা হয় (১,৫৪,৫৭,৯৩০+১,১৭,৮২,০০০) = ২,৭২,৩৯,৯৩০ (দুই কোটি বাহাত্তর লক্ষ উনচল্লিশ হাজার নয়শত ত্রিশ) টাকা। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট এর মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ১২ জনকে ১২ টি রিক্শা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করেন।

যাকাত অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

যাকাত তহবিল শিরোনামে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ মুরাদপুর শাখার (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ) মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব নং- ৩০০৪-১২১০০০০৫২২১-এ সরাসরি যাকাতের টাকা পাঠানো যাবে। এছাড়াও গাউসিয়া হক মন্‌জিল (মাইজভাণ্ডার শরিফ)। গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ্ শরিফে (বিবিরহাট, পাঁচলাইশ) যাকাত অর্থ দেওয়া যাবে।

গত ১৬ এপ্রিল ২০১৬ শনিবার নগরীর বিবিরহাটস্থ এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট মিলনায়তনে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত 'দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল)'-এর ১৪তম পর্বে যাকাত বিতরণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও নগরীর মুরাদপুরস্থ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ।

এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট আয়োজিত মহিলাদের মাসিক আত্মজিজ্ঞাসামূলক অনুষ্ঠান 'আলোর পথে'র মার্চ ২০১৬ পর্বের অনুষ্ঠানে ট্রাস্ট ব্যবস্থাপনায় মহিলাদের ২য় পর্যায়ের 'মাসয়ালা-মাসায়িল প্রশিক্ষণ'-এ অংশগ্রহণকারীদের সনদ প্রদান করছেন নগরীর ড্রিম ওয়েভার্স একাডেমি'র শিক্ষক আলিমা আরিফা বিল্লাহ্।

এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট আয়োজিত মহিলাদের মাসিক আত্মজিজ্ঞাসামূলক অনুষ্ঠান 'আলোর পথে'র মার্চ ২০১৬ পর্বে **'ধর্মীয় দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন : বৈবাহিক সম্পর্ক ও স্বামী-স্ত্রীর হক'** বিষয়ে আলোচনা করছেন নগরীর ড্রিম ওয়েভার্স একাডেমি'র শিক্ষক আলিমা আরিফা বিল্লাহ্।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

১. **মাদ্‌রাসা-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (আলিম),** মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
২. **উম্মুল আশেকীন মুনওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হিফ্‌যখানা,** মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
৩. **গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী ইসলামিক ইন্‌স্টিটিউট,** চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
৪. **শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) স্কুল,** শান্তিরদ্বীপ, গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
৫. **মাদ্‌রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী,** হামজারবাগ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম।
৬. **শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ইসলামি একাডেমি,** হাইদগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৭. **শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া ও নূরানী মাদ্‌রাসা,** সুয়াবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৮. **বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা,** হাটপুকুরিয়া, বটতলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।
৯. **মাদ্‌রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হিফ্‌যখানা ও এতিমখানা,** মনোহরদী, নরসিংদী।
১০. **জিয়াউল কুরআন নূরানী একাডেমি,** পূর্ব লালানগর, ছোট দারোগার হাট, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
১১. **মাদ্‌রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী,** সৈয়দ কোম্পানী সড়ক, ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১২. **শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা,** পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৩. **মাদ্‌রাসা-ই-শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী,** বৈদ্যেরহাট, ভুজপুর, চট্টগ্রাম।
১৪. **শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা,** ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৫. **মাদ্‌রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী,** খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৬. **জিয়াউল কুরআন ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা ও ইবাদাতখানা,** চরখিজিরপুর (ট্যাক্সঘর), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৭. **শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা,** মেহেরআটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৮. **জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা,** এয়াকবুদন্ডী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৯. **শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা,** চন্দনাইশ (সদর), চট্টগ্রাম।
২০. **হক ভাণ্ডারী নূরানী মাদ্‌রাসা, নূর আলী মিয়া হাট,** ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২১. **শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরিফ ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা,** চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
২২. **মাইজভাণ্ডার শরিফ গণপাঠাগার।**

শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প:

- শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি তহবিল

দাতব্য চিকিৎসাসেবা প্রকল্প:

- হোসাইনী ক্লিনিক (মাইজভাণ্ডার শরিফ)।

দরিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প:

- যাকাত তহবিল।
- দুস্থ সাহায্য তহবিল।

মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প:

- মাইজভাণ্ডারী একাডেমি।
- মাসিক আলোকধারা।

সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প:

- মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী।
- মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন।

জনসেবা প্রকল্প:

- **দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী,** মুরাদপুর মোড়, চট্টগ্রাম।
- **দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী ও ইবাদাতখানা,** নাজিরহাট তেমুহনী রাস্তার মাথা।
- **দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী,** শান-ই-আহমদিয়া গেইট সংলগ্ন, মাইজভাণ্ডার শরিফ।
- **ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরিফ)।**